মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-১১, সংখ্যা-০৪

মে ২০২২ ইং, শাওয়াল ১৪৪৩ হি., জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বাং

شوال ١٤٤٣ھ، مايو٢٠٢٢م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.facebook.com/মাসিক আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :..... ৭
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১০
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
ইসলামে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলদের জরুরি গুণাগুণ-১৪..১১
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন সম্পর্কে সঠিক আকীদা-১....১৬
শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব (দা.বা.)
মিডিয়াকর্মীদের প্রতি.....**১৯**
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.)
কোরআন-হাদীস থাকতে মাযহাব কেন?-৯..... ২২
খতীবে ইসলাম আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী
যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল.....**২৯**
মুফতী শাহেদ রহমানী
সাদকাতুল ফিতর, ঈদুল ফিতর
ফাজায়েল ও মাসায়েল.....**৩৬**
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
কাদিয়ানী ধর্মমত-৫.....**৪০**
মুফতী শরীফুল আজম
পানিসংকট রোধে ইসলামের নির্দেশনা..... **৪৪**
মুফতী মুহাম্মদ মর্তুজা
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান **৪৬**

মোবাইল : প্রধান সম্পাদক : ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক : ০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক : ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯ বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি : ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

কওমী মাদরাসার শিক্ষাবর্ষ শুরু

মাহে শাওয়াল। হিজরী বর্ষের দশম মাস। এ মাস থেকে আরম্ভ হয় উপমহাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহের শিক্ষাবর্ষ। সে হিসেবে আল্লাহ চাহেন তো কওমী মাদরাসাগুলোতে এ মাসেই ভর্তি কার্যক্রম চলবে। যাঁর যাঁর মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে তালিবে ইলমগণ অবতীর্ণ হবেন ভর্তিযুদ্ধে। কিছুদিনের মধ্যে অনেক মাদরাসায় দরসও আরম্ভ হয়ে যাবে। আমরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ইলমে নববী অর্জন এবং খিদমাত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দেওয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করি।

মূলত ইলমে নববী অর্জন করতে পারেন আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিগণ। পবিত্র কোরআন-সুন্নাহের খিদমাতে যাঁরা থাকেন তাঁদেরকেই হাদীস শরীফে উত্তম ব্যক্তি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই দ্বীনি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার এই নিয়ামতের কদর ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক।

কদর ও মূল্যায়ন করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন ওই বিষয়ের প্রকৃত ভক্তি ও শ্রদ্ধা অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। ইলম অনুযায়ী আমল করা। নিয়্যাত সহীহ করা। অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা। যে বিষয় অর্জন করার জন্য এত মেহনত, সেটা পরিপূর্ণভাবে অর্জনের চেষ্টা করা। অনুকূল-প্রতিকূল সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করা।

কওমী মাদরাসা শুধু ইলমী দরসেগাহ নয়, বরং ইলম অর্জনের পাশাপাশি তাজকিয়া ও তারবিয়্যাতেরও দরসেগাহ। ইলম ও তাজকিয়ার ব্যাপারে তো আমাদের মাঝে কিছু কিছু আলোচনা হয়ে থাকে। আজকে তালিবে ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব তারবিয়্যাতের প্রতি।

বলাবাহুল্য, আজকের সমাজে তারবিয়্যাত তথা চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক অনীহা এবং অবহেলা। শুধু কি তাই, যেখানে এক শ্রেণির প্রগতিশীল সমাজ ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ পার্থক্য করার জন্যও রাজি নয়, সেখানে সচ্চরিত্র অর্জনের বিষয়টি উপেক্ষিত হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। তাই দেওবন্দি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতিরেকে প্রচলিত সকল শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত সীমিত। অথচ আখলাক বা সচ্চরিত্র সুশীল-আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অন্যতম মৌল বিষয়। এর অভাবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র–এমনকি পুরো দুনিয়াও প্রভাবিত হতে পারে। বর্তমান বিশ্বসমাজ তারই বাস্তব সাক্ষী।

আমাদের রয়েছে নববী আখলাকের এক বিশাল অধ্যায়, যা ছিল বিশ্বজয়ের একটি মহামহিম হাতিয়ার। তথাপি পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে এর প্রতি গুরুত্বারোপে অসংখ্য দিকনির্দেশনা রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত করো এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। তার ফল হবে এই যে, যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এই গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবরের পরিচয় দেয় এবং এই গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা মহাভাগ্যবান। (হামীম সিজদা-৩৪, ৩৫)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ .

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, মুমিন ব্যক্তি তার সদাচারের জন্য রোজাদার ও নামায আদায়কারী ব্যক্তির সমান মর্যাদা লাভ করে থাকে। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৭২৩)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ .

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, মীযানে (পাল্লায়) ওজনের সময় সদাচারের চেয়ে অধিক ওজনবিশিষ্ট আর কিছু হবে না। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৭২৪)

মনে রাখতে হবে ইলমী, আমলী এবং তারবিয়্যাতী প্রতিষ্ঠানে যাদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয়েছে তা আল্লাহর পরম রহমতেই হয়েছে। নববী কাননের সৌরভে সুবাসিত হওয়ার এই সুযোগ সকলের ভাগ্যে আসে না। তাই আমাদের ইলমে নববী, তাজকিয়া ইত্যাদি অর্জনের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দিতে হবে আখলাকে নববীর আলোকে জীবন গড়ার প্রতি।

দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন পুরো উম্মতকে আখলাকে নববীর সৌরভে সুরভিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২০/০৪/২০২২ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٨) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠)

৯৭। আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে হেরেমে কোরবানীর জন্তুকেও, যেগুলোর গলার বিশেষ ধরনের বেড়ি পরানো রয়েছে। এর কারণ এই যে যাতে তোমরা জেনে নাও যে আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছু জানেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৯৮। জেনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল-দয়ালু।

৯৯। রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে করো এবং যা কিছু গোপনে করো।

১০০। বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহকে ভয় করো–যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।

শান্তির চারটি উপায়

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, কাবা। আরবী ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে খাস'আম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে কা'বায়ে ইয়ামানিয়াহ বলা হতো। তাই বায়তুল্লাহকে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য কা'বা শব্দের সাথে البيت الحرام শব্দ যোগ করা হয়েছে।

قيام ও قوام শব্দটি اسم مصدر এর অর্থ ওই সব বস্তু, যার ওপর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قياما للناس এর অর্থ হবে এই যে কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

নাস শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এ ক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা যেতে পারে। বাহ্যত সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে আল্লাহ তা'আলা কা'বা তথা বায়তুল্লাহকে এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত আরো কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যত দিন পর্যন্ত জগতের প্রতি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজব্রত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ যাদের ওপর হজ ফরজ তারা হজ করতে থাকবে, তত দিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এক বছর কালও হজব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আজাব নেমে আসবে।

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ

এই বিষয়বস্তুটি তাফসীরবিদ হযরত আতা (রহ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন : لو تركوه عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا (বাহরে মুহীত)। এতে বোঝা গেল যে, তাৎপর্যগতভাবে খানায়ে কা'বা সমগ্র বিশ্বের জন্য স্তম্ভ বিশেষ। যত দিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ পালিত হতে থাকবে, তত দিনই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোনো সময় বায়তুল্লাহর এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেওয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহর মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে তার স্বরূপ জানা জরুরি নয়। যেমন চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়কুটার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহর সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীর জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

বায়তুল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ

সাধারণত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা

করা হয়। এসব কারণে ডাকাত, চোর, লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহিলিয়াত যুগের আরবে কোনো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জননিরাপত্তার জন্য কোনো নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জানমাল ও মান-সম্ভ্রমের ওপর যখন-তখন আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোনো গোত্রের পক্ষে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহকে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো ধৃষ্টতা যেমন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা জাহিলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হতো না।

সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বে প্রবাদ বাক্যের মতো খ্যাত ছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তু-সামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতর অপরাধীও যদি একবার হেরেম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ ও ওমরাহর নিয়্যাতে বাড়ি থেকে বের হতো কিংবা যে জন্তু হেরেম শরীফে কোরবানীর জন্য আনা হতো তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোনো অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ ও ওমরাহর কোনো লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাঁধা অবস্থায় কোনো প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে করে ওমরাহর এহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহর উদ্দেশে রওনা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত উসমান (রা.)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদের বলে দেন যে মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়্যাতে নয়–ওমরাহ আদায় করার জন্য এসেছে। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

কোরাইশ সর্দাররা অনেক আলাপ-আলোচনার পর মহানবী (সা.)-এর খিদমতে একজন প্রতিনিধি পাঠায়। এ প্রতিনিধিকে দেখামাত্রই মহানবী (সা.) বললেন, লোকটিকে বায়তুল্লাহর সম্মান-সম্ভ্রমে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। কাজেই চিহ্নযুক্ত কোরবানীর জন্তুগুলোকে দেখে সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করল যে, মুসলমানদের বায়তুল্লাহ গমনে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

মোটকথা, জাহিলিয়াত যুগেও আল্লাহ তা'আলা আরবদের মনে হেরেম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হেরেম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ ও ওমরাহর জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এ দ্বারা কোনো উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ ও হেরেম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হতো। আরবরা এ মাসগুলোকে আসহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা'বার সাথে আরো তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে : প্রথমত, الشهر الحرام অর্থাৎ সম্মান ও মহত্ত্বের মাস। এখানে شهر শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তাফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে شهر حرام বলে জিলহজ মাসকে বোঝানো হয়েছে। এ মাসেই হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে جنس হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে, هدى হেরেম শরীফে যে জন্তুকে কোরবানী করা হয় তাকে هدى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত, তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কোরবানীর জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু قلائد এটি قلادة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গলার হার। জাহিলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজের উদ্দেশ্যে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত, যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোনো কষ্ট না দেয়। কোরবানীর জন্তুর গলায়ও এ ধরনের হার পরিয়ে দেওয়া

হতো। এসব হারকেও قلائد বলা হয়। এর কারণে قلائد ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে সম্মানিত মাসসমূহ কোরবানীর জন্তু এবং গলার হার এই তিনটি বস্তুই বায়তুল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহর সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকথা এই যে বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীর জন্য বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قياما للناس এর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে বায়তুল্লাহ ও হেরেমকে সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীর জন্য রুজি-রোজগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসী যেহেতু কা'বা গৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহর ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। قياما للناس বাক্যে তাদের এর বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আব্দুল্লাহ রাযী (রহ.) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য নেই। এ সবই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহকে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীর বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থাৎ আমি বায়তুল্লাহ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্য স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসী বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে থাকে। এটা এ জন্য বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে কোনো গোনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না বরং তাওবাকারী অনুতপ্ত লোকদের জন্য ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

অর্থাৎ আমার রাসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে তিনি আমার নির্দেশাবলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে, তারা না মানলে আমার রাসূলের কোনোই ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনে রাখো যে আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন–সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ

আরবী ভাষায় طيب ও خبيث দুটি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طيب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خبيث বলা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতে خبيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طيب শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে خبيث ও طيب শব্দ দুটি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভালো ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে কোনো সুস্থ-বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভালো ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভালো ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে :

وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদের বিস্মিত করে দেয় এবং আশপাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভালো বলে মনে

করতে থাকে, আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ।

আয়াতের শানে নুযুল :

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি মদের ব্যবসা করত এবং এ পথে বেশ অর্থ-সম্পদও উপার্জন করেছিল। ইসলামে মদ্যপান ও মদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধঘোষিত হয়ে গেলে সে লোক মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদের ব্যবসা দ্বারা সঞ্চিত যেসব টাকা-পয়সা আমার কাছে রয়েছে, সেগুলো কোনো সৎকাজে ব্যয় করে দিলে আমার জন্য উপকার হবে কি? মহানবী (সা.) বললেন, যদি তুমি এসব টাকা-পয়সা হজ, জিহাদ ইত্যাদি কাজেও ব্যয় করো তবু তা আল্লাহর কাছে মাছির ডানার সমানও মূল্যবান হবে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।

এ হচ্ছে পরকালের দিক দিয়ে হারাম মালের মর্যাদা। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এবং প্রত্যেক কাজের শেষ পরিণতিকে সামনে রাখলে বোঝা যায় যে, জগতের কাজকারবারেও হারাম ও হালাল মাল সমান নয়। হালাল মাল দ্বারা যতটুকু উপকার, সুফল এবং সত্যিকার সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, হারাম মাল দ্বারা তা কখনো লাভ করা যায় না।

তাফসীরে দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, তাবেয়ীদের জমানার খোলাফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) পূর্ববর্তী খলীফাদের আরোপিত অবৈধ কর রহিত করে দেন এবং যাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ-কড়ি আদায় করা হয়েছিল, তা সবই ফেরত দিয়ে দেন। ফলে সরকারি ধনাগার শূন্য হয়ে যায় এবং আমদানি সীমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে জনৈক প্রাদেশিক গভর্নর খলিফার কাছে পত্র লিখলেন যে, সরকারি আমদানি অনেক হ্রাস পেয়েছে। এখন সরকারি কাজকারবার কিভাবে চলবে, তা-ই চিন্তার বিষয়। খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) উত্তরে আলোচ্য

لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

আয়াতটি লিখে অতঃপর লেখেন : তোমার পূর্ববর্তী গভর্নররা অন্যায় ও অত্যাচারের মাধ্যমে ধনাগার যতটুকু পূর্ণ করেছিল, তুমি এর বিপরীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় ধনাগারকে ততটুকু হ্রাস করে নাও এবং কোনো পরোয়া করো না। আমাদের সরকারি কাজকর্ম টাকা-পয়সা দিয়েই পূর্ণ হবে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এর ব্যাপক অর্থ এই যে, সংখ্যার কমবেশি কোনো বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাস্বল্পতা দ্বারা কোনো বস্তুর ভালো-মন্দ যাচাই করা যায় না। মাথার ওপর হাত গণনা করে ৫১ হাতকে ৪৯ হাতের বিপক্ষে সত্য ও সত্যবাদিতার মাপকাঠি বলা যায় না।

বরং জগতের সকল স্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ভালো বিষয়ের পরিমাণ ও সংখ্যা কম এবং মন্দ বিষয়ের সংখ্যা অধিক। ঈমানের বিপরীতে কুফর, আল্লাহভীতি, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার বিপরীতে পাপাচার ও অন্যায়াচরণ, ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীতে জুলুম ও উৎপীড়ন, জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানতা ও সুবুদ্ধির বিপরীতে কু-বুদ্ধির প্রাচুর্য বিদ্যমান। এতে এরূপ বিশ্বাসই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, কোনো বস্তু কিংবা কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে বস্তু বা দলের ভালো ও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ কিছুতেই হতে পারে না। বরং কোনো বস্তুর উৎকৃষ্টতা ব্যক্তিগত অবস্থা ও হাল-হাকিকতের ওপরই তা নির্ভরশীল। অবস্থা ও হাল-হাকিকত ভালো হলে বস্তুটি ভালো, নতুবা মন্দ। কোরআন পাক এ সত্যটিই وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ বাক্যে ফুটিয়ে তুলেছে।

অবশ্য ইসলামও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যকে চূড়ান্ত মীমাংসা সাব্যস্ত করেছে। তবে তা ওই সব ক্ষেত্রেই যেখানে যুক্তির সারবত্ত ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাচাই করার মতো কোনো ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা বিদ্যমান নেই। এ ক্ষেত্রে জনগণের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উদাহরণত গভর্নর নিযুক্তির প্রশ্নে যদি কোনো নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী শাসনকর্তার অভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে জনগণের মতানৈক্য পরিহারের লক্ষ্যে সংখ্যাধিক্যকেই অগ্রগণ্য মনে করা হয়। এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে অধিকসংখ্যক লোক যে কাজ করবে তাই হালাল, বৈধ ও সত্য হবে।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে :

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ হে জ্ঞানবানগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো বস্তুর সংখ্যাধিক্য কামনা করা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘুতার বিপরীতে সত্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা বুদ্ধিমানদের কাজ নয়। তাই বুদ্ধিমানদের সম্বোধন করে এ ভ্রান্ত কর্মপন্থা থেকে বিরত রাখার জন্য فاتقوا الله আদেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ شَدَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُول :يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُحِقُّ فِيهَا الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كلَّ أُمٍ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا"

হযরত শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, হে লোকগণ! দুনিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। এটা হতে পুণ্যবান ও পাপাচারী উভয়েই ভোগ করে। আর আখেরাত একটি সত্য অঙ্গীকার। তথায় ন্যায়পরায়ণ সকল ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ বিচার করবেন। তিনি (তাঁর সিদ্ধান্তে) সত্যকে বহাল রাখবেন এবং মিথ্যাকে মিটিয়ে দেবেন। সুতরাং তোমরা পরকালের সন্তান হও, ইহকালের সন্তান হয়ো না। কেননা প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুসারী হয়। (আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব বারানী ৭০১২)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى رَوَاهُمَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ"

হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই তাঁর দুই পাশে দুজন ফেরেশতা এরূপ বলতে থাকেন, যা জিন ও মানব ছাড়া সকল সৃষ্টিকে শ্রবণ করানো হয়, হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে চলে আসো। যে সম্পদের আধিক্য আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন রাখে, তা হতে প্রয়োজন পরিমাণ অল্প মালই শ্রেয়। (আবু নুয়াইম হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/২২৬, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০১৯৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২৯৫১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৩২৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৮৪৪৫, আল মু'জামুল আওসাত্ব ২৫৪১)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ " :إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ :مَا قَدَّمَ؟ وَقَالَ بَنُو آدَمَ :مَا خَلَّفَ؟ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ফেরেশতাগণ বলেন, সে (আখেরাতের জন্য) আগাম পাঠিয়েছে কি? আর তার ওয়ারিশগণ বলে, সে রেখে গিয়েছে কি? [শু'আবুল ঈমান (বায়হাকী) ১০৪৭৫]

وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ :أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ :يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوعَدُونَ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ وَإِنَّكَ قَدْاسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ دَارًا تَسِيرُإِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا .رَوَاهُ رزين

হযরত মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে বললেন, হে পুত্র! মানুষের সাথে যে সকল বিষয় ওয়াদা করা হয়েছে, তার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আর তারা আখেরাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। হে পুত্র! তুমি যেদিন জন্ম লাভ করেছ, সেদিন হতে তুমি দুনিয়াকে পেছনে ফেলে ক্রমাগত আখেরাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। বস্তুত তুমি যে ঘরের দিকে চলেছ, তা সে ঘর হতে খুবই নিকটবর্তী, যে ঘর হতে তুমি যাত্রা করেছ। (অর্থাৎ দুনিয়া হতে) (রাযীন)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ :كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ .قَالُوا :صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ :هُوَ النَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, যার অন্তঃকরণ নিষ্কলুষ এবং যে সত্যভাষী। সাহাবীগণ বললেন, সত্যভাষী কে তা বোঝতে পারি, কিন্তু নিষ্কলুষ অন্তরের পরিচয় কী? তিনি বললেন, যে অন্তর কালিমা মুক্ত স্বচ্ছ ও পবিত্র, যাতে পাপ ও জুলুমের চিন্তা নেই, হিংসা-বিদ্বেষের স্থান নেই। (ইবনু মাজাহ ৪২১৬)

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا :حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ .رَوَاهُ أَحمد وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকলে দুনিয়ার আর কোনো কিছু না থাকলেও তোমার কোনো ক্ষতির কারণ নেই। বস্তু চারটি হলো : ১. আমানত রক্ষা করা, ২. সত্য কথা বলা, ৩. সচ্চরিত্রবান হওয়া এবং ৪. পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন করা। (মুসনাদে আহমাদ ২/১৭৭, শু'আবুল ঈমান ৪৮০১)

وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ الْحَكِيمِ :مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرى؟ يَعْنِي الْفَضْلَ قَالَ :صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي .رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ

হযরত মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, হযরত লোকমান (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখছি, তা আপনি কিভাবে লাভ করলেন? তিনি বললেন, সত্য কথা বলা, আমানত যথাযথভাবে আদায় করা এবং অহেতুক ও বাজে কথা ও কার্য বর্জন করা দ্বারা। (মুওয়াত্তা মালিক ১৮১৩/১৭)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :تَجِيءُ الْأَعْمَالُ فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ فتَقُوْلُ: يَارَبِّ أَنَا الصَّلَاةُ .فَيَقُولُ :إِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ .فَتَجِيءُ الصَّدَقَة فَيَقُولُ :يَارَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ .فَيَقُولُ :إِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيء الصّيامُ فَيَقُولُ :يَارَبِّ أَنَا الصِّيَامُ .فَيَقُولُ :إِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ .ثُمَّ يَجِيءُ الْأَعْمَالُ عَلٰى ذٰلِك .يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى :إِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ. ثُمَّ يَجِيءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ :يَا رَبِّ أَنْتَ السَّلَامُ وَأَنَا الْإِسْلَامُ . فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى :إِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ اٰخُذُ وَبِكَ أُعْطِي . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي كِتَابِهِ :(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِيْن

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, রোজ কিয়ামতে (মানুষের) আমলসমূহ উপস্থিত হবে। সর্বপ্রথম নামায এসে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি নামায;
আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণময়। তারপর সদকা এসে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি সদকা; আল্লাহ বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। তারপর রোযা আসবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি রোজা। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। অতঃপর অন্যান্য আমল এরূপ আসবে এবং বলতে থাকবে। আর আল্লাহও বলতে থাকবেন, তুমি কল্যাণময়। এরপর ইসলাম এসে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার এক নাম সালাম এবং আমি হলাম ইসলাম। আল্লাহ বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। বস্তুত আজ আমি তোমার কারণেই পাকড়াও করব এবং তোমারই উসিলায় পুণ্য দান করব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেছেন, "এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে তার কোনো কিছুই কবুল করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে শামিল হবে"। (মুসনাদে আহমাদ ২/৩৬২)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيه فَإِنِي إِذا رَأَيْتُه ذَكَرْتُ الدُّنْيَا "

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একটি পাখির ছবিযুক্ত পর্দা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন পর্দাটি দেখতে পেয়ে বললেন, হে আয়েশা! তা বদলিয়ে ফেলো। কেননা আমি তা দেখামাত্রই দুনিয়ার বিলাসিতা আমার স্মরণে এসে যায়। (মুসনাদে আহমাদ ২/২৪১, নাসায়ী ২/৩০১, ইবনুল মুবারক, আয যুহদ ৪০০-৪০১)

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :عِظْنِي وَأَوْجِزْ .فَقَالَ :إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاس

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, (একদা) এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, সে নামাযকেই তোমার জীবনের শেষ নামায বলে মনে করবে। আর তুমি কখনো তোমার মুখ দিয়ে এমন কথা বের করবে না, যার জন্য কিয়ামত দিবসে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। আর মানুষের নিকট যা আছে, তোমার নিকট তা না থাকলেও তুমি তোমার মনকে খুশি রাখবে। (ইবনু মাজাহ ৪১৭১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৫৯১, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৩৮৯০)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِه فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ :يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هٰذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هٰذَا وَقَبْرِي "فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ :إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا رَوَى الْأَحَادِيث

الْأَرْبَعَة أَحْمد

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় তাঁকে উপদেশ দিতে দিতে তাঁর সাথে বের হলেন। এ সময় মু'আয ছিলেন বাহনের পিঠে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথে চলছিলেন পদব্রজে। মু'আয (রা.)-কে উপদেশ দান শেষ করে বললেন, হে মু'আয! মনে হয় এ বছরের পর তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না। এমনও হতে পারে যে, তুমি এই মসজিদ এবং আমার কবরের পার্শ্ব দিয়েই অতিক্রম করবে। এ কথা শুনে হযরত মু'আয রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচ্ছেদাশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে শুরু করেন, তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) মদীনার পানে ফিরে বললেন, নিশ্চয়ই সে সকল লোকই আমার নিকটতম, যারা ধর্মভীরু, পরহেজগার। তাই তারা যেকোনো লোকই হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন? (সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৭, মা'রিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫০৯২)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ .فَقِيلَ :يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ؟ قَالَ :نَعَمْ التَّجَافِي مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হেদায়েতের নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন অন্তর উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই অবস্থাটি বোঝার কোনো নিদর্শন আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রতারণার গৃহ তথা দুনিয়া হতে পৃথক থাকা এবং চিরস্থায়ী গৃহ তথা আখেরাতের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। (শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ১০৫৫২)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي خَلَّادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ .رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং আবু খাল্লাদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কোনো বান্দাকে দেখবে যে, সে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী এবং স্বল্পালাপী, তার সাহচর্য অবলম্বন করবে। কেননা তাকে নিগূঢ় জ্ঞান দান করা হয়েছে।

(মুসনাদে আবু ইয়ালা ৬৮০৩, শু'আবুল ঈমান ৪৯৮৫, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৪৫৩)

মুফতী আরশাদ রাহমানী হাফিযের অনুমতি ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে
অনলাইন নিউজ পোর্টাল আওয়ার ইসলাম টোয়েন্টিফোর ডটকমের উদ্যোগে

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান রহ.

কে নিয়ে একটি প্রামাণ্য স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

ফকীহুল মিল্লাত রহ.কে নিয়ে আপনার মূল্যায়নধর্মী যেকোনো স্মৃতিকথা লিখে বা রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে।

মেইল- ourislammedia@gmail, হোয়াটসঅ্যাপ- +৮৮০১৭২৬৬৮৮৬৮৬

OUR ISLAM

ঠিকানা- ৫৮/৩১-৫ মদিনাবাগ (এম খাঁন টাওয়ার) ওয়াসা রোড
উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা ১২১৪, নিউজরুম : ০১৭১৯-০২৬৯৮০
Email : newsourislam24@gmail.com

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

সত্যবাদীদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য :

সাদিকীন তথা সত্যবাদী কারা এবং এদের বৈশিষ্ট্য কী? শরীয়তের আলোকে সাদিক তথা সত্যবাদী তারা, যাদের আকীদা ঠিক, ইবাদত ঠিক, লেনদেন ঠিক, আখলাক-চরিত্র ঠিক এবং সামাজিক লেনদেন, আচার-ব্যবহার–সবই ঠিক। ইসলামের যে পাঁচ বিভাগ আছে আকীদা, ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাক–এই পাঁচ বিভাগে যে ঠিক হয়ে যাবে সেই হলো শরীয়তের আলোকে সাদিক তথা সত্যবাদী।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে বরং পুণ্য এই যে, লোকে আল্লাহর প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি ও তাঁর নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদের দান করবে এবং দাস মুক্তিতে ব্যয় করবে আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যখন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে তা পূরণে অভ্যস্ত থাকবে এবং সংকটে-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য-স্থৈর্যে অভ্যস্ত থাকবে। এরাই তারা, যারা সত্যবাদী (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা ১৭৭)

উল্লিখিত আয়াতে মৌলিকভাবে শরীয়তের সকল বিধানের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতে আকীদা বিশ্বাস, ইবাদাত, মোআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাক তথা চরিত্র ইত্যাদি সব কিছুর কথা একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে পবিত্র এ আয়াতকে ইসলামী বিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জামে তথা পরিপূর্ণ আয়াত বলা হয়। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি (রহ.) বলেন,

والاٰية جامعة للكمالات الانسانية صريحا او ضمنا دالة على صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس

এই আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সামগ্রিক গুণাগুণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই আয়াত মানুষকে আকীদা বিশ্বাস ঠিক করার, সামাজিক উন্নয়ন এবং আখলাক-চরিত্র সুন্দর করার শিক্ষা দেয়।

এই মৌলিক গুণগুলোর কথা আরম্ভ করা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দকে শিরোনাম বানিয়ে। তা হলো بـــر এই শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যাবতীয় ইবাদত, তা'আত এবং কল্যাণমূলক–সব কিছুই এই শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হয়।

البر اسم جامع لانواع الخير والطاعات المقربة الى الله تعالى

بـــر শব্দটির মর্মার্থে যাবতীয় কল্যাণকর বিষয় অন্তর্ভুক্ত, এমন সব ইবাদত ও তা'আতও অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করে।

আয়াতে সব কিছু উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাদের মধ্যে এই সমস্ত গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটবে তাদের পদ হলো :

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

এরাই তারা, যারা সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।

বোঝা গেল, মুত্তাকী, নেককার ও আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য আকীদা এবং ইবাদত যেমন ঠিক হতে হবে, তেমনি লেনদেন, আচার-ব্যবহার এবং চরিত্রও ঠিক হতে হবে। ওপরেও শরীয়ত মতে হবে, ভেতরেও শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে। মানুষ যখন এরূপ গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে তখন সে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী সাদিক তথা সত্যবাদী এবং মুত্তাকী হিসেবে পরিগণিত হবে।

আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন,

ولعمرى من عمل بهذه الاية فقد استكمل الايمان وانال اقصى مراتب الايقان۔

কসম, যে লোক উক্ত আয়াতের ওপর আমল করেছে সে ঈমান পরিপূর্ণ করেছে এবং সর্বোচ্চ বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছে।

এসব গুণ ব্যতীত মানুষ পরিপূর্ণ মুত্তাকীও হতে পারে না, নেককারও হতে পারে না। যদি কোনো মানুষের এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যায় তবে সে পরিপূর্ণ মুত্তাকী এবং সত্যবাদী। আর এরূপ লোকের সান্নিধ্য গ্রহণেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আমরা শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য যেকোনো লোকের কাছে দৌড়ে যাই না বরং এমন ডাক্তারের কাছেই যাই, যে সনদপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ, খ্যাত এবং মানুষ যার কাছে চিকিৎসা নিয়ে উপকার পায়। তেমনি আত্মিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও শুরুতে যাচাই করে নিতে হবে কার সান্নিধ্যে থেকে মেহনত করলে সফলতা আসবে। আত্মশুদ্ধির কাজে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এসব চিন্তা করেই এমন আল্লাহওয়ালা নির্বাচন করতে হবে, যার সান্নিধ্য অর্জন করলে সত্যি সত্যিই আত্মিক রোগের চিকিৎসা পাওয়া যাবে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

ইসলামে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলদের জরুরি গুণাগুণ-১৪

২৭. ধর্মীয় ও পার্থিব উন্নতির চেতনা থাকা এবং তার শিক্ষা দেওয়া

প্রতিষ্ঠানপ্রধান তিনিই হবেন, যিনি জাতিকে ধর্মীয় ও পার্থিব উন্নতির চেতনা দেবেন। তিনি যেমন জাতিকে ধর্মীয় উন্নতির প্রতি আগ্রহী করবেন, তেমনি জাগতিক উন্নতিতেও আগ্রহী করে তুলবেন। এবং হালাল সম্পদ উপার্জনে উৎসাহিত করবেন। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানপ্রধান তার সকল অধীনের মাঝে ধর্মীয় উন্নতির পাশাপাশি পার্থিব উন্নতির জন্যও অনুপ্রেরণা জোগাবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছেন, যদিও তাদের সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ :

اطلبوا العلم ولو بالصين

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন করো, যদিও সুদূর চীন থেকে হোক।' (কানযুল উম্মাল : ১০/১৩৮, হা. ২৮৬৯৭)

অনুরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের কৃষিকাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

ماأكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده۔

'স্বীয় হস্তে উপার্জিত খাবার থেকে সর্বাপেক্ষা উত্তম খাবার কেউ আহার করেনি।' (বোখারী শরীফ : ২/২৭৮)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لوكان فى الجنة تجارة لامرت بتجارة البز

'যদি জান্নাতে ব্যবসা থাকত; তবে আমি মানুষকে কাপড়ের ব্যবসা করার নির্দেশ দিতাম।' (কানযুল উম্মাল : ৪/৩৩, হা. ৯৩৬০)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

التمسوا الرزق فى خبايا الارض

'তোমরা পৃথিবীর গভীরে, অর্থাৎ কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা সন্ধান করো।' (আল মু'জামুল আওসাত : ৬/৮৬, হা. ৮০৯৭)

হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি :

একদা হযরত উমর (রা.) লোকদের উদ্দেশে বললেন,

غدا سيكون لكم ابناء وحفدة، فما ذا يغنى عنكم هو الذى بايديكم

'অতিশীঘ্রই তোমাদের সন্তান ও নাতি-পুতি হবে, তাহলে এখন তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তা কিভাবে তোমাদের চাহিদা পূরণ করবে? অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করো।' (ইবনে জাওযী, মানাক্বীবু আমীরিল মু'মিনীন , প. ২১৪)

হযরত উমর (রা.) বলেন,

تعلموا المهنة فانه يوشك ان يحتاج احدكم الى مهنته

'তোমরা জাগতিক দক্ষতা অর্জন করো, কেননা তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই জাগতিক দক্ষতার প্রয়োজন পড়বে।' (ইবনে জাওযী, মানাক্বীবু আমীরিল মু'মিনীন, পৃ. ১৫২)

সুতরাং দায়িত্বশীল এবং প্রতিষ্ঠানপ্রধানের দায়িত্ব হলো অধীনদের দ্বীনি উন্নয়নের দিকে তো খেয়াল রাখবেন, তদুপরি তার মনন, রুচি এবং যোগ্যতার প্রতি লক্ষ রেখে পার্থিব উন্নয়নের প্রতিও লক্ষ রাখবেন।

পটিয়া মাদরাসায় থাকাকালীন আমরা ফারেগ ছাত্রদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ছিলাম। মাদরাসা থেকে ফারেগ ছাত্ররা এতে ভর্তি হয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সেলাই, ফ্যাশন ডিজাইন ইত্যাদির মত ভালো কাজ শিখত এবং কর্মদক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কাজ করত। কারিগরি বিভাগটি কওমী অঙ্গনে জামিয়া পটিয়াতেই সর্বপ্রথম খোলা হয়েছিল এবং এখনো চলছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এগুলো সবই ফারেগ হওয়ার পর। আগে মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে। মাদরাসার মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও তারবিয়্যাত। এর সাথে পার্থিব বিষয় জুড়ে দিলে দ্বীনি ইলম অর্জন ব্যাহত হয়। সেই কারণে আকাবীরগণ মাদরাসার পরিবেশকে শুধু পড়াপড়ি এবং তারবিয়্যাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

২৮. বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা

নম্রতা সাধারণ মুসলমানদের জন্য এবং

বিশেষ করে দায়িত্বশীল ও প্রশাসকদের জন্য একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

'তাওয়াজু' নম্রতার সংজ্ঞা :

ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.) লেখেন,

التواضع : رضى الانسان بمنزلة دون ما يستحقه ومنزلته

'নম্রতা হলো, একজন উচ্চ পদের যোগ্য ব্যক্তি নিম্নতর পদে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।' (আয যরীয়াহ ইলা মাকারিমিশ শরীয়াহ, পৃ. ১৫২)

পবিত্র কোরআনের আলোকে নম্রতা :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين

'আর যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মুমিনের প্রতি বিনয়ী হও।' (সূরা শু'আরা-২১৫)

অন্যত্রে ইরশাদ হচ্ছে,

ولاتصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا ان الله لايحب كل مختال فخور۔

'অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না, আর পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা কোরো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা লোকমান-১৮)

অন্যত্রে ইরশাদ হচ্ছে,

وعباد الرحمٰن الذين يمشون على الارض هونا واذ خاطبهم الجٰهلون قالوا سلٰما۔

'আর রাহমানের বান্দা তারাই, যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদের যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন বলে, সালাম। (আমরা বিতর্কে লিপ্ত হতে চাই না।)' (সূরা ফুরকান-৬৩)

আল্লামা কাদেরী লেখেন,

كل من يلى امور المؤمنين داخل فى هذا الامر

'প্রত্যেক মুসলিম আমীর এই আদেশের অন্তর্ভক্ত।' (আর কেফাআতুল ইদারিয়াহ : ৪৬)

হাদীসের আলোকে নম্রতা :

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

التواضع لايزيد العبد الا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله

'বিনয়ী ও নম্রতার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অতএব, তোমরা নম্রতা অবলম্বন করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।' (কানযুল উম্মাল; ৩/১১০, হা. ৫৭১৯)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়েশা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

ياعائشة رض تواضعى فان الله عزوجل يحب المتواضعين ويبغض المتبكرين۔

'হে আয়েশা! তুমি নম্রতা অবলম্বন করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিনয়ীকে পছন্দ করেন আর অহংকারীকে অপছন্দ করেন।' (কানযুল উম্মাল : ৩/১১৩, হা. ৫৭৩৪)

অন্যত্র তিনি ইরশাদ ফরমান,

لا تواضع احد لله الا رفعه الله

'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিনয়ী করবে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে উন্নীত করবেন।' (মুসলিম শরীফ : ২/৩২১)

খোলাফায়ে রাশেদীনদের মাঝে বিনয় ও নম্রতা :

খোলাফায়ে রাশেদীনের পুরো জীবন বিনয় ও নম্রতার সাজে সজ্জিত ছিল। তাঁরা কোনো অবস্থাতেই নম্রতাকে অগ্রাহ্য করেননি, এমনকি তাঁদের পাঠানো চিঠিতেও নম্রতা ফুটে উঠত। এ মর্মে নিম্নে কিছু নমুনা প্রদত্ত হলো :

১.

هذا ماكتب عبد الله ابو بكر خليفة محمد النبى ﷺ لاهل نجران

এই চিঠিটি আল্লাহর বান্দা খলিফায় রাসূলুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিকের পক্ষ থেকে নাজরানের অধিবাসীদের প্রতি। (কিতাবুল খারাজ-১৬০)

২.

هذا ماكتب عبد الله عمر امير المؤمنين لاهل نجران

এই চিঠিটি আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমর ফারুকের পক্ষ থেকে নাজরানের অধিবাসীদের প্রতি। (কিতাবুল খারাজ-১৬০)

৩.

من عبد الله عثمان امير المؤمنين الى الوليد بن عقبة سلام عليك۔

এই চিঠিটি আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উসমানের পক্ষ থেকে ওয়ালিদ বিন উকবার প্রতি–তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (কিতাবুল খারাজ-১৬০)

৪.

هذا كتاب من عبد الله على امير المؤمنين لاهل نجران

এই চিঠিটি আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন আলীর পক্ষ থেকে নাজরানের অধিবাসীদের প্রতি। (কিতাবুল খারাজ-১৬২)

খলিফা চতুষ্ঠয় তাঁদের সকলের চিঠি শুরু হয়েছে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা বহনকারী শব্দগুচ্ছ 'আল্লাহর বান্দা' দ্বারা।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) কখনো কখনো অপ্রাপ্ত বাচ্চাদের হাত ধরে দু'আ নিতেন। বলতেন,

বাদশাহকে দেখো, যে গরিবের বেশ ধারণ করেছে। লোকসমাজে এমন মানুষের মর্যাদা সুউচ্চ। এবং এ গুণের কারণে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বাঙ্গীন কল্যাণ অর্জিত হয়।' (কানযুল উম্মাল : ৫/৭৬৪, হা. ১৪৩১২)

হযরত উমর ও উসমানের কার্যপদ্ধতি :

হযরত উমর ও উসমানের জীবনের বাঁকে বাঁকে ভরপুর বিনয় ও নম্রতা স্ফুটিত হয়। এ মর্মে নিম্নে কিছু উক্তি প্রদত্ত হলো :

হযরত মালেক (রহ.)-এর স্বীয় চাচা এবং তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

انه رأى عمر وعثمان اذا قدما من مكة ينزلان بالمعرس، فاذا ركبوا ليدخلوا المدينة لم يبق منهم احد الا اردف غلاما فدخلوا المدينة على ذلك، قال: عمر و عثمان يردفها، فقلت له: ارادة التواضع؟ قال نعم والتماس حمل الراجل لئلا يكونوا كغيرهم من الملوك ، ثم ذكر ما احدث الناس من ان يمشوا غلمانهم خلفهم، وهم ركبان ويعيب ذلك عليهم۔

তিনি হযরত উমর ও উসমান (রা.)-কে দেখেছেন যে, যখন তাঁরা মক্কা থেকে আসতেন, তখন তাঁরা মা'রাস নামক স্থানেই বাহন থেকে নেমে যেতেন। অতঃপর যখন তাঁরা মদিনায় প্রবেশের জন্য বাহনে আরোহণ হতেন, তখন তাঁরা নিজেদের পেছনে গোলামকে নিয়ে আরোহণ করতেন এবং এ অবস্থাতেই মদিনায় প্রবেশ করতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি বিনয় ও নম্রতার কারণে এমন করছেন? তাঁরা বললেন, জি, হ্যাঁ! যাতে তাঁরা অন্য শাসকদের মতো না হয়ে যান। অতঃপর তাঁরা হযরত আলী (রা.)-এর কার্যপদ্ধতি ছিল যে,

كان يمشي في الاسواق وحده وهو وال

তিনি বাজারে একাই যেতেন অথচ তিনি খলিফা ছিলেন। (কানযুল উম্মাল : ১৩/১৮০, হা. ৩৬৫৩৮)

বিচারক, শাসক এবং নেতৃত্বদানকারীর জন্য নম্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ

হযরত মেকদাদ (রা.)-এর ঘটনা :

استعمل النبي ﷺ المقداد على سرية فلما رجع قال النبي ﷺ كيف رأيت الامارة؟ قال خرج يارسول الله وما ارى ان لي فضلا على احدمن القوم فما رجعت الا وكلهم عبيدلي فقال رسول الله ﷺ وكذلك الامارة ابا معبد!

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মিকদাদ (রা.)-কে একটি যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করলেন। তিনি প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এমারতকে কিভাবে সামলিয়েছেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন অবস্থায় জিহাদে গিয়েছি যখন আমি নিজেকে অন্য কারো ওপর প্রাধান্য দিইনি। যখন আমি ফিরে আসি তখন দেখলাম সমস্ত মুজাহিদ আমার খুবই অনুগত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এমারত এবং নেতৃত্ব এরূপই হয়ে থাকে। (মুস্তাদরাকে হাকেম ৩/৩৪৯)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ফরমান,

اذا اردت شريف الناس كلهم فانظر الى ملك في زيّ مسكين ذاك الذي حسنت في الناس فاقته وذاك تصلح للدنيا وللدين

'যদি তোমরা মানুষের মাঝে সবচেয়ে মহৎ মানুষকে দেখতে চাও, তবে ওই

كان عمرؓ ربما يأخذ بيد الصبي فيقول: ادع لي فانك لم تذنب بعد

'আমার জন্য দু'আ করো, কারণ তুমি এখনো কোনো গোনাহ করোনি, তাই আমার জন্য তোমার দু'আ খুব দ্রুত কবুল হবে। (মানাকীবু আমীরিল মুমিনীন : ২১০)

৫.

رأيت عمر بن الخطاب يمشي الى العيد حافيا

হযরত আবু যর (রা.) বলেন, 'আমি হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে খালি পায়ে ঈদগাহে নামাজ পড়তে যেতে দেখেছি। (কানযুল উম্মাল : ১২/৬৫, হা. ৩৫৯৯৩)

৬.

رأيت عثمان نائما في المسجد في لجفة ليس حوله احد وهو امير المؤمنين، وفي رواية: رأيت عثمان يقيل في المسجد ويقوم واثر الحصا في جنبه فيقول الناس هذا امير المؤمنين۔

হযরত হাসান (রা.) বলেন, 'আমি একদা হযরত উসমান (রা.)-কে মসজিদের এক কোণে শুয়ে থাকতে দেখলাম, কিন্তু তাঁর পাশে কাউকে দেখলাম না। অথচ তিনি তৎকালীন খলিফা ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি হযরত উসমান (রা.)-কে এমন এক অবস্থায় দেখলাম যে, তিনি মসজিদের কোনো এক কোণে দুপুরবেলা আরাম করছেন। যখন তিনি সজাগ হলেন, তখন তাঁর শরীরে পাথরের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আশপাশের লোকজন বলতে লাগল, দেখো! ইনি আমীরুল মুমিনীন। (ইযালাতুল খাফা : ২/২২৫)

৭.

মানুষের স্বাভাবিক আরোহণের ব্যাপারে বললেন যে, মানুষ সাধারণত নিজের বাহনের পেছনে গোলামকে রাখতে অপছন্দ করে। (কানযুল উম্মাল : ২/১৪৩, হা. ৮৫১০)

'তাওয়াজু' নম্রতার প্রকারভেদ ও স্তর

নম্রতা দুই ধরনের : ভালো ও মন্দ। আল্লামা ইবনে হিব্বান (মৃত্যু : ৩৫৪ হি.) লেখেন :

التواضع توضعان: احدهما محمود، والآخر مذموم، فالتواضع المحمود: ترك التطاول على عبا دالله والازدراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذى الدنيا رغبة فى دنياه، فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الاحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها۔

'নম্রতা দুই প্রকার, একটি ভালো এবং অন্যটি খারাপ। প্রথম প্রকারের অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দাদের উপর বাড়াবাড়ি এবং তাদের নিকৃষ্ট মনে করা পরিহার করা। আর নিন্দনীয় নম্রতা হলো দুনিয়াদারের সামনে পার্থিব স্বার্থে নম্রতা প্রদর্শন করা। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রথম প্রকার অবলম্বন করেন এবং সর্বাবস্থায় দ্বিতীয় প্রকার থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

আল্লামা ইবনে হিব্বান (রহ.) আরো লেখেন :

التواضع لله ضربين: احدهما تواضع العبد لربه عند مايأتى من الطاعات غير معجب بفعله ولاراء له عنده حالة توجب له اسباب الولاية، الا ان يكون المولى جل وعلى هو الذى يتفضل عليه بذلك وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات۔والتواضع الآخر: هو ازدراء المرء نفسه، واستحقاره اياها، عند ذكر ماقارف من الماثم حتى لايراى احدا من العالم الا ويرى نفسه دونه فى الطاعات، وفوقه فى الجنايات۔

আল্লাহর জন্য তাওয়াজু দুই প্রকারের। ১. যা মুসলমান ইবাদতের সময় করে। যে ইবাদত নিজের বড়ত্ব জাহিরের জন্য হয় না, লোক দেখানোর নিয়্যাত থাকে না। এরূপ তাওয়াজু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক। এর মাধ্যমে আল্লাহর করুণা আসে। এরূপ ইবাদত মানুষকে আত্মতুষ্টি ও অহমিকা থেকে নাজাত দেয়। দ্বিতীয়টি হলো, মানুষের যখন নিজের গোনাহের কথা স্মরণ আসে তখন সে নিজেকে নিজে গালমন্দ করে, মানুষের মধ্যে নিজেকে খুব ছোট মনে করে এবং নিজেকে বড় পাপী মনে করে। (রাওজাতুল উকালা ৯২)

নম্রতা ও অসম্মানের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাম যোবাইদী (মৃত্যু : ১২০৫ হি.) লেখেন :

নম্রতা ও অপদস্থতার মধ্যে পার্থক্য হলো, নম্রতা আসে প্রভুর সত্তা জ্ঞান এবং তার গুণাবলি জানা থেকে, তার মহিমা ও ভালোবাসার জ্ঞান থেকে এবং নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে অবগতি লাভের জ্ঞান থেকে। যা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকুলের প্রতি মমতা ও বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর দরবারে মস্তক অবনত করার নাম। আর নিজের ও আত্মসম্মানের স্বার্থে যে অপদস্থতা অবলম্বন ও আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দেওয়া হয়, সেটা অসম্মান। প্রথমটি হলো সম্মানজনক আর দ্বিতীয়টি হলো লাঞ্ছনাকর। (ইতহাফুস সাদাহ আল মুতক্বিনীন : ৮/২৫০)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান :

طوبى لمن تواضع فى غير منقصة۔

'ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যেকোনো ত্রুটি বা দোষ ছাড়া বিনম্রতা অবলম্বন করে।' (আত তারগীব ওয়াত তারহীব : ৩/১৪১, হা. ৩৪১৭)

নিজের অবস্থান উল্লেখ করা বিনয়ের পরিপন্থী নয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রওহা নামক স্থানে ঘোড়ার পিঠে আরোহী হয়ে মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা উত্তর করল : আমরা মুসলমান। অতঃপর তারা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (মুসলিম শরীফ : ৩/৪৪১)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান,

'কিয়ামত দিবসে আমি বনী আদমের সরদার হবো, কিন্তু আমি তা অহংকার করে বলছি না।' (তিরমিযী শরীফ : ২/১৪৭)

কেননা কখনো কখনো নিজের অবস্থান বলার দ্বারা নিজের পরিচয় তুলে ধরা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কখনো সম্মিলিত স্বার্থ আবার কখনো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে হয়, তাই এ সকল পদ্ধতিতে নিজের অবস্থান তুলে ধরা জায়েয। যা নম্রতার পরিপন্থী নয়।

আল্লামা কাদেরী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন,

فيه وجهان: احدهما: امتثالا لامر الله تعالى: واما بنعمة ربك فحدث۔ وثانيهما : انه من البيان الزى يجب عليه تبليغه الى امته ليعرفوه، ويعقدوه ،

ويعملوا بمقتضاه فى توقيره۔

قال الراغب: وقد يحسن مدح الانسان عند تنبيه المخاطب على ماخفى عليه من حاله۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই ফরমানের দুটি দিক। প্রথমত, এতে আল্লাহ তা'আলার ওই নির্দেশের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা যে, 'আপনি আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাখ্যা করুন।' দ্বিতীয়ত, এটি এমন একটি বক্তব্য, যার মাধ্যমে দ্বীনকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে লোকেরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদাকে চিনতে পারে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং তার সম্মান ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তাকে অনুসরণ করতে পারে।

ইমাম রাগেব (রহ.) বলেন, 'কখনো কখনো একজন ব্যক্তির জন্য তার নিজের প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করা ভালো যাতে করে সে সম্বোধনকারীর কাছে তার লুকানো অবস্থা প্রকাশ করতে পারে।' (মেরকাত : ১০/৩০ ফাজায়েল অধ্যায়-৫৭৬১)

হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি :

হযরত উমর (রা.) বলেন,

انتم المؤمنون وانا اميركم

'তোমরা মুমিন আর আমি তোমাদের আমির।' (তারীখে তবারী : ৪/২০৮)

বিচারক ও শাসকগোষ্ঠীর জন্য নম্রতার সুবিধাসমূহ

নম্র হওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে। আল্লামা কাদেরী লেখেন,

الاول: ان ولى الامر الذى اصبح مسؤولا عن الامة قد تأخذه العزة بالاثم۔ غير رسول الله ﷺ فيتعالى على الناس بخلاف من ليس له ولاية فانه لايوجد لتعاليه على الناس الداعى الموجود عند ولى الامر۔

নম্র হওয়ার পরিবর্তে দাম্ভিকতার সাথে চলার একটি ক্ষতি হলো, ওই শাসক যাকে প্রজাদের অনুশাসনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে কখনো পদের বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ করে বসে, পক্ষান্তরে যার কোনো পদ বা দায়িত্ব নেই সে মানুষের কাছে অহংকার করার কোনো কারণ দেখে না।

الثانى: ان توضع ولى الامر لرعيته محجلب لمحبتهم له، والتفافهم حوله، وطاعتهم واياه، واذا حصل ذلك عم الود والاطمينان، واستتب الامن فى البلاد۔

দ্বিতীয় বিষয় হলো, শাসকদের প্রজাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন, এটা শাসকের প্রজাদের সাথে মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ। যা প্রজাদের শাসকের আনুগত্যের প্রতি নিয়ে যায়। যার ফলে রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বিরাজ করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। (আল কিফায়াতুল ইদারিয়া ফিস সিয়াসাতিশ শরয়ীয়াহ : ৪৬)

নম্রতার অন্যান্য উপকারিতা

আল্লামা মালুহী নম্রতার বেশ কিছু উপকারিতা সম্পর্কে বলেন,

১.

التواضع خلق كريم من اخلاق المؤمن، ودليل محبة رب العالمين

নম্রতা মুমিন বান্দার একটি বিশেষ গুণ। এটি আল্লাহ তা'আলার সাথে মুহাব্বতের নিদর্শন।

২.

هو طريق موصل الى مرضاة الله والى جنته

নম্রতা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সহজে জান্নাতে পৌঁছার জন্য একটি সুগম পথ।

৩.

هو السبيل الى قرب من الله ومن ثم القرب من الناس

নম্রতা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে খুব সহজেই মানুষের হৃদয় জয় করা যায়।

৪.

التواضع عنوان سعادة العبد فى الدارين

নম্রতা উভয় জগতে সফলতার চাবিকাঠি।

৫.

يحب الله المتواضعين، ويكلؤهم برعايته، ويحيطهم بعنايته

মহান আল্লাহ তা'আলা বিনয়ী ও নম্রতা প্রদর্শনকারীকে ভালোবাসেন এবং নিজ কুদরতেই তাকে সকল অনিষ্টতা থেকে হেফাজত করেন।

৬.

المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الاكبر

বিনয়ী ব্যক্তিগণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবেন।

৭.

هو دليل على حسن الخاتمة، وعلى حسن الخلق

নম্রতা উত্তম শেষ পরিণতি ও সুখময় জীবনের নিদর্শন।

৮.

التواضع يؤدى الى حصول النصر، والبركة فى المال والعمر۔

নম্রতা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্য এবং জান-মালে রহমত-বরকত বয়ে নিয়ে আসে। (নাদ্‌রাতুন না'য়ীম : ৪/১২৬৮)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন সম্পর্কে সঠিক আকীদা-১

শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব (দা.বা.)

কিয়ামতপূর্ব প্রকাশিতব্য দশটি বৃহৎ সংকেতের অন্যতম একটি হলো আকাশ থেকে ঈসা (আ.)-এর অবতরণ। সর্বত্র দাজ্জালের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কালো ধোঁয়ায় হৃত শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই ঈসা (আ.) উর্ধ্ব আকাশ থেকে নিম্ন মানবভূমিতে অবতরণ করবেন। দাজ্জালসহ সকল অনিষ্টকর ফিতনা থেকে তিনি পৃথিবীকে পবিত্র করবেন।

প্রিয় পাঠক! কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখা যেমন প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অবশ্যকর্তব্য, তেমনি কিয়ামতপূর্ব প্রকাশিতব্য আলামতগুলোর ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রেখে তদ্‌সংক্রান্ত সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করাও জরুরি। তা ছাড়া ঈসা (আ.)-এর অবতরণকালীন করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিই উক্ত পরিস্থিতিতে কোরআন-হাদীসের আলোকে নিজেকে ও অধীন লোকদিগকে সুপথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। সর্বোপরি অধুনাকালে কিয়ামতের আলামত নিয়ে নিত্যনতুন প্রচারিত বিভ্রান্তকর সংবাদ দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এ সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা পবিত্র কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সহজ-বোধগম্য ভাষায় ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনকে বিভিন্ন শিরোনামে সাজিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছেই তাওফীক কামনা করছি!

ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন

কোরআন দ্বারা প্রমাণিত অসংখ্য হাদীসে ঈসা (রা.)-এর পুনরাগমনের কথা বিবৃত হয়েছে। কোরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় ও মর্ম আলোচনায় তাফসীর বিশারদগণ ঈসা (রা.)-এর পুনরাগমন কোরআন দ্বারা সমর্থিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরআন বিশারদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

(অর্থ : আহলে কিতাবদের প্রত্যেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ওপর ঈমান আনবে। সূরা নিসা, আয়াত : ১৫৯)। উপরিউক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনকে বোঝানো হয়েছে। [সূত্র : মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৩২০৭, ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেছেন, হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী।]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে যে, আহলে কিতাবের প্রত্যেকে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ওপর ঈমান আনবে। আর এই বিষয়টি সংঘটিত হবে কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ.)-এর মানবভূমিতে পুনরাগমনকালে। তখন সকল আহলে কিতাব তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করবে। কারণ অমুসলিমদের থেকে শুল্ক গ্রহণ করে তাদেরকে বসবাসের সুযোগ দেওয়ার রীতি তিনি উঠিয়ে দেবেন এবং ইসলামভিন্ন অন্য কোনো ধর্ম তার নিকট গ্রহণীয়-সহনীয় বলে বিবেচ্য হবে না। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৪৭)

২. হযরত ইকরিমা (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) (وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ) এই বাক্যটির عـلـم শব্দের ع ও لام এ যবর দিয়ে পড়তেন। (এতে অর্থ হয়, এবং নিশ্চয় তিনি কিয়ামতের একটি নিদর্শন। সূরাতুয্ যুখরুফ, আয়াত : ৬১) এবং বলতেন, উক্ত আয়াতে কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ.)-এর আগমনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। (সূত্র : মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৩৬৭৫, ইমাম যাহাবী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ)

অবতরণের সময়কাল ও প্রেক্ষাপট

শেষ জমানায় পৃথিবী অনাচার-অবিচারে ভরে গেলে আল্লাহ তা'আলা জমিনে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবীজির বংশোদ্ভূত মুহাম্মাদ নামক একজন মহৎ ব্যক্তিকে পাঠাবেন। তাঁর পিতা-মাতা

যথাক্রমে আব্দুল্লাহ ও আমেনা হবেন। তিনি কোরআন-হাদীসের অনুশাসন চালু করে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবেন। দ্বীনি মহলে যিনি 'মাহদী' নামে খ্যাত।

এরূপ অবস্থায় কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে দাজ্জালের ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করবেন। পৃথিবীর বুকে দাজ্জালের ফিতনাই হবে সবচেয়ে মারাত্মক ভয়ানক ফিতনা। তার শয়তানি ক্ষমতা দেখে বহু লোক সত্যচ্যুত হয়ে পড়বে। ঘরে-বাইরে কোথাও মানুষ এই ফিতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে না। (তবে হাদীসে বর্ণিত করণীয়গুলো অবলম্বন করলে সেই ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। যার বিশদ বিবরণ বিগত সংখ্যাগুলোতে 'দাজ্জাল সম্পর্কে সঠিক আকীদা' প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।)

এই ফিতনা ক্রমে পৃথিবীজুড়ে সর্বত্র শিকড় গেড়ে বসবে। এই ফিতনার মোকাবেলায় নেককার লোকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পড়বে। বান্দার চূড়ান্ত চেষ্টা-মেহনত যেখানে বিফল হয় দয়াময় আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ সেখান থেকেই শুরু হয়। প্রতারক দাজ্জালের ফিতনা সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈসা ইবনে মারইয়াম ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করবেন। দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রঙের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম দুজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে অবতরণ করবেন। ফজরের নামাযের ইকামতের সময় তিনি মুসলমানদের সাথে মিলিত হবেন এবং তাঁদের ইমামের পেছনে মুক্তাদি হয়ে নামায আদায় করবেন। নামাযের পর দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়বেন।

বি.দ্র. : দলিলভিত্তিক বিস্তারিত জানার জন্য এপ্রিল সংখ্যার 'দাজ্জাল সম্পর্কে সঠিক আকীদা-৪' নামে লিখিত প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

ঈসা (আ.)-এর শারীরিক অবয়ব

হাদীসের মধ্যে ঈসা (আ.)-এর আকার-আকৃতিও আলোচিত হয়েছে। ভূপিষ্ঠে অবতরণকালে তাঁর বাহ্যিক বেশভূষা কেমন হবে তাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার মাঝে ও ঈসা (আ.)-এর মাঝে কোনো নবী নেই। তিনি অবশ্যই পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হবেন। তোমরা তাঁকে দেখে এভাবে চিনবে যে, তিনি মধ্যম গঠনের লোক, তাঁর দেহবর্ণ হবে সাদা লালে মিশ্রিত এবং হলুদ রঙের দুটি কাপড় পরিহিত হবেন। তাঁর মাথার চুল ভেজা না থাকলেও মনে হবে চুল হতে যেন বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। (সূত্র : সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৩২৪, মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৪১৬৩, ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এক রাতে স্বপ্নে আমি কা'বা শরীফের কাছে আমাকে দেখতে পেলাম। গোধূম বর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখলাম। এ বর্ণের যত লোক তোমরা দেখেছ তিনি হলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল তাঁর। এ ধরনের চুলের অধিকারী যত ব্যক্তি তোমরা দেখেছ তাঁদের মধ্যে তিনি হলেন সবচেয়ে সুন্দর। তিনি এ চুল আঁচড়িয়ে রেখেছেন আর তা থেকে পানি ঝরছিল। দুজনের কাঁধে ভর করে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)। (সূত্র : সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৯)

মুসলিম শরীফের অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, ঈসা (আ.)-এর চুলগুলো হবে স্বাভাবিক, অতিশয় কোঁকড়ানো হবে না। (সূত্র : সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৭)

মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে, ঈসা (আ.) সুঠাম দেহবিশিষ্ট হবেন। (সূত্র : সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৫)

৩. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে দেখেছি। তাঁর সাথে সাদৃশ্যে নিকটতম ব্যক্তি হচ্ছে উরওয়াহ্ ইবনে মাসঊদ। (সূত্র : সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৭)

আখেরি নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ঈসা (আ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক

নবীগণের পরস্পরের মাঝে ঘনিষ্ঠপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ঈসা (আ.) ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা তুলনামূলক আরো নিবিড় ও অনেক গভীর। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইহকাল ও পরকালে আমি হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের অধিক প্রিয় ব্যক্তি। নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয়

ভাই। তাঁদের সকলের দ্বীন-ধর্ম একটি। আমার মাঝে আর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের মাঝে কোনো নবী নেই। (সূত্র : মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৪১৫৩, ইমাম যাহাবী বলেছেন, হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী)

পৃথিবীতে ঈসা (আ.)-এর অবস্থানকাল

ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করে পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবেন, এসংক্রান্ত দুই ধরনের হাদীস পাওয়া যায়।

১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-কে পাঠাবেন। তিনি দেখতে উরওয়াহ বিন মাসঊদের মতো। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর পৃথিবীতে সাত বছর অবস্থান করবেন। (সূত্র : সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৯৪০)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর রূহ ঈসা ইবনে মারইয়াম ৪০ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর ইন্তেকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযা নামায আদায় করবেন। (সূত্র : সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৩২৪, মুসতাদরাকে হাকীম, হাদীস : ৪১৬৩, ইমাম যাহাবী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ)

দুই হাদীসের বিরোধ নিরসন

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর অনবদ্য তাফসীরে উভয় হাদীস উল্লেখ করত এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, মুসলিম শরীফের হাদীসে আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, ঈসা (আ.) সাত বছর অবস্থান করবেন। এই সাত বছরের অবস্থান হলো ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের পর। পক্ষান্তরে আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ৪০ বছর অবস্থান করবেন। এর দ্বারা তাঁকে আকাশে উত্তোলন করার আগের ও অবতরণ করার পরের পুরো সময় উদ্দেশ্য। কারণ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী ৩৩ বছর বয়সে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আল্লাহই সর্বাজ্ঞ। (সূত্র : তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৪৬৬)

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রা.) থেকে বর্ণিত, ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-কে ৩৩ বছর বয়সে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সূত্র : মুসতাদরাকে হাকীম, হাদীস : ৫১৭৩, سكت عنه الذهبى فى التلخيص

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেওয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেওয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেওয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রিম বা জামানত নেওয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১৪০০	১৮০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১৯০০	২৭০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	২০০০	২৮০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	২৮০০	৪০০০
#	আমেরিকা	৩২০০	৪৩০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

বিকাশ: ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭, রকেট: ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭-৯

মিডিয়াকর্মীদের প্রতি

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী (দা.বা.)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি এই বিশ্বজগৎকে অস্তিত্বদান করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবীর প্রতি, যিনি দুনিয়ায় সত্য ধ্বনি বুলন্দ করেছেন।

কোনো জাতির মন-মানসিকতা নির্মাণ ও বিনাশে সাংবাদিকতা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কোনো সচেতন ব্যক্তির তা অজানা নয়। বর্তমানকালে এমন কোনো শিক্ষিত পরিবার পাওয়া যাবে না, সংবাদপত্রের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই; বরং সংবাদপত্র এখন শিক্ষিত মানুষের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে সত্য-সঠিক কথা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। বিশেষত দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া তো আজকাল বলতে গেলে চলেই না। যারা লেখাপড়া জানে না, সংবাদপত্র পড়তে পারে না, এমনকি ভালোভাবে বুঝতেও পারে না, তারা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

এদিকে লক্ষ করলে সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত, তাদের ওপর সমগ্র জাতির অত্যন্ত কঠিন দায়দায়িত্ব বর্তায়। তারা জীবনের যে শাখা অবলম্বন করেছে, তা কেবল একটা বাণিজ্যিক পেশা বা উপার্জন মাধ্যম মাত্র নয়; বরং জাতির চিন্তা-চেতনা গঠন ও মন-মানসিকতার পথপ্রদর্শনের জন্য এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি পদমর্যাদা, যে পদের দায়িত্ব অতি নাজুক এবং জিম্মাদারি অতি ভারী। কোনো ব্যক্তির আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়টা যদি জাতীয় ও সামষ্টিক সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তবে বলতে হবে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার প্রতি অনেক বড় মেহেরবানি। এটা তার বিশাল নেয়ামত। কেননা এই অবস্থান থেকে তার দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ একই কাজ দ্বারা অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এ কাজকে খালেস ব্যবসা সাব্যস্ত করত এর সামষ্টিক স্বার্থকে ব্যাবসায়িক মুনাফার নজরানা বানিয়ে দেওয়া হবে।

আফসোস! আমরা যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের সাংবাদিকতাকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন কেবল আক্ষেপ ও হতাশাই প্রকাশ করতে হয়। আমাদের এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে পেছনের বছরগুলোতে আমাদের সাংবাদিকতা নতুন প্রজন্মের মন-মানসিকতা বিগড়ানো, তাদের আখলাক-চরিত্র ধ্বংস করা এবং তাদেরকে ইন্দ্রিয়চাহিদার গোলাম বানানোর কাজ ষোল আনাই আঞ্জাম দিয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো রকম ত্রুটি করেনি। একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব হলো, যে বিষয়টাকে দেশ ও জাতির অবস্থাদৃষ্টে সত্য-সঠিক মনে করবে, তাকে নির্ভয়ে-নিঃসংকোচে সত্য বলবে এবং তার প্রকাশে কোনো রকম প্রলোভন ও রক্তচক্ষুকে প্রতিবন্ধক হতে দেবে না। কিন্তু আফসোস! আমাদের সাংবাদিকতায় হক-নাহকের ফয়সালা বেশির ভাগ সরকার বা জনগণের গতিবিধি দেখেই করা হয়ে থাকে।

আমাদের সাংবাদিক মহলের একটা গ্রুপ এমন আছে, যারা ক্ষমতাসীনদের প্রশংসা ও গুণকীর্তণে এবং তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের সমর্থনদানে কোনো রকম কার্পণ্য করে না। এ কাজে তাদের অভ্যাস এমনই পাকাপোক্ত, কোনো রকম পরিস্থিতির বদল তার ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। আমাদের সাংবাদিকতায় এমন নজির এক-দুটি নয়; বরং অসংখ্য পাওয়া যাবে যে একই ব্যক্তি কোনো ক্ষমতাসীনকে তার আমলে যুগের চন্দ্র-সূর্য সাব্যস্ত করছে, তার প্রতিটি জায়েয ও নাজায়েয কাজকে সঠিক ও সুন্দর সাব্যস্ত করছে এবং সে কাজের সপক্ষে উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিচ্ছে, কিন্তু যেই না সে ব্যক্তি শাসনক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় এবং তার স্থানে তার বিরোধী কোনো ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হয়, অমনি সেই প্রাক্তন সরকারকে একজন দুঃশাসক ও চরম স্বৈরাচারী সাব্যস্ত করছে এবং তার শাসনকালকে অসংকোচে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শাসনকাল বলে ধিক্কার দিচ্ছে।

অন্যদিকে একদল সাংবাদিক এমন যে সর্বস্তরে সমাদৃত ও জননন্দিত হওয়াই তাদের পরম লক্ষ্যবস্তু। এই লক্ষ্যার্জনের স্বার্থে তারা জনগণকে সঠিক পথপ্রদর্শন করার পরিবর্তে তাদের খেয়াল-খুশি অনুগমন করে থাকে এবং যে কথা জনগণের প্রশংসা কুড়াবে না বা তাদের কাছে পছন্দ হবে না, তারা সর্বদা এমন কথা এড়িয়ে যায়, বাস্তবিক পক্ষে তা জনগণের পক্ষে যতই কল্যাণকর হোক না কেন। বলতে দ্বিধা নেই এটা আমাদেরই কর্মফল যে আমরা কখনো সর্বজনপ্রিয় কোনো শাসক পাইনি আর

এরই ফলশ্রুতিতে দেশে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে যে সরকারের বিরুদ্ধে দুই কলম লিখতে পারলে সে জনগণের হিরো হয় যায়। এমনিতে কথাটি ভালো কি মন্দ তা বিবেচ্য থাকে না। সরকারের বিরুদ্ধে হলেই ব্যস, তা জনগণ লুফে নেয় এবং তা তাদের প্রশংসা কুড়ায়। এ কারণেই কোনো কোনো সাংবাদিক সরকারবিরোধিতাকে নিজের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। এরূপ করাটা জনস্বার্থের জন্য জরুরি কি না এবং দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর কি না, অনেক সময় সেদিকে লক্ষ থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে কেবল এটাই যে এর বিনিময়ে জনগণের পক্ষ হতে নির্ভীক ও সত্যভাষী হওয়ার খেতাব জুটে যাবে এবং গলায় প্রশংসা ও সাধুবাদের মালা পরানো হবে। পরিণামে সংবাদপত্রের মাধ্যমে গণমানসিকতার যে পথপ্রদর্শন করা সম্ভবপর ছিল, তা সরকারবিরোধী ও সরকারপক্ষ কোনো সংবাদপত্র দ্বারাই অর্জিত হচ্ছে না।

আরো বেশি বিপজ্জনক ব্যাপার হলো আজকালকার সংবাদপত্রসমূহ তার বাহ্যিক কাঠামো ও নৈতিক নীতিমালা তৈরি করার সময় জাতির ওপর বিশেষত অপরিপক্ব মানসিকতার ওপর তার কী প্রভাব পড়বে, তা একটুও ভেবে দেখার দায়বোধ করে না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই লিখতে হচ্ছে যে ব্যাবসায়িক মুনাফার দৌড়ে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ নীতি-নৈতিকতার সকল মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছে। আজ অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি সংবাদপত্র অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। সিনেমার বিজ্ঞাপনসমূহ যে কতটা নোংরা এবং তা যে কী পরিমাণ চরিত্র ধ্বংসের জীবানুবাহী, তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার পড়ে না। অথচ পত্রিকাসমূহ তা প্রকাশে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। অনেক সময় তো পত্রিকার সাধারণ সংবাদের প্রচারও এমনভাবে হয়ে থাকে, যা কোনো শরীফ ও লাজুক ব্যক্তির পক্ষে শিশুদের সামনে পড়া সম্ভব হয় না। আখলাক-চরিত্র সংক্রান্ত অপরাধের খবর অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তার বিশদ বিবরণ এমন চুটিয়ে চুটিয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, যেন তার চেয়ে মজাদার খাদ্য আর কিছু নেই। আর কিছু না হোক, অন্তত পক্ষে ভিনদেশি কোনো নায়িকা-নর্তকীর রসালো খবর প্রচার করার জন্য পত্রিকাগুলো যেন মুখিয়ে থাকে। তুচ্ছ-তুচ্ছ বাহানায় তাদের নগ্ন বা অর্ধ উলঙ্গ ছবি ছেপে দেওয়া হয়। নীতি-নৈতিকতার কোনো রকম ধারই তারা ধারে না। এসব পত্রিকার এমন কোনো সংখ্যা পাওয়া যাবে না, যাতে চরিত্রবিধ্বংসী কোনো ছবি থাকে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিদেশি কোনো রাজকন্যা কারো সাথে যদি অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে কিংবা প্রসিদ্ধ কোনো নারী কোনো দ্বীপে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে হানিমুন পালন করে, তবে তাতে এ দেশের তরুণদের কী অপরাধ যে তার বিশদ কেচ্ছা শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের মন-মানসিকতা নষ্ট করা হচ্ছে? তা ছাড়া এটা এমন কী সংবাদ, যে সম্পর্কে অবহিত হওয়া এ দেশবাসীর জন্য ফরয হয়ে গেছে? কিংবা কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে পারস্পরিক মান-অভিমানের পর যদি সমঝোতা হয়ে যায়, তবে এই দেশের নবীনদের কী দায় পড়ল যে তার বিশদ সম্পর্কে তাদের জানতেই হবে? কিন্তু আমাদের সংবাদপত্রসমূহ এমন যে তা এ জাতীয় সংবাদ অত্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে তার গলিত পুঁজ আমাদের তরুণদের সামনে পরিবেশন করে এবং তা এমনই গুরুত্বের সঙ্গে যে সারা জগতে যেন এর চেয়ে দরকারি কোনো সংবাদ নেই।

এমনিতেও সাংবাদিকতাকে নিছক ব্যবসায়ের মাধ্যম বানানো কোনো ভালো কাজ নয়; বরং এটাকে একটা নিন্দনীয় কাজই বলতে হবে। তথাপি ব্যাপারটা এতটুকুতে সীমিত থাকলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি গড়িয়েছে তো আরো বহুদূর কাঁচামনের দুর্বলতাকে পুঁজি করে অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করার মতো ঘৃণ্য কাজ আর কিছু হতে পারে কি? আমাদের সংবাদপত্রসমূহ আজ এই নিকৃষ্টতম বাণিজ্য অবলীলায় করছে। সাংবাদিকতার মতো পবিত্র কাজ এই ন্যক্কারজনক তৎপরতার ফলে আজ পুঁতিগন্ধময় হয়ে গেছে। তার চেয়ে আফসোসের কথা হলো, আমাদের সাংবাদিকতায় এই পাক-নাপাকির অনুভূতিটুকু পর্যন্ত যে শেষ হতে চলেছে এবং উত্তরোত্তর এই বিপজ্জনক কর্মপন্থা আরো বেশি সঙ্গিন হয়ে উঠছে। বিগত কয়েক বছরে পরিস্থিতি কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে, তা পরিমাপ করার জন্য আজ থেকে বিশ বছর আগের কোনো সংবাদপত্রকে আজকে সংবাদপত্রের সাথে তুলনা করে দেখুন। তাহলে অনুমান করতে পারবেন আমাদের সাংবাদিকতায় নগ্নতা ও অশ্লীলতার বিষাক্ত জীবাণু কী ক্ষিপ্রতার সাথে সংক্রমিত হয়েছে।

আজকে এই আলোচনায় আমরা আমাদের দেশের পত্রিকা সম্পাদক ও মিডিয়াকর্মীদের সমীপে আবেদন রাখতে চাই যে আল্লাহর ওয়াস্তে নিরীহ জনগণের ওপর একটু দয়া করুন। আজ তারা বৈষয়িক ও নৈতিকভাবে চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন। নিজ মেজাজ ও রুচি এবং দ্বীন ও ধর্মের দিক থেকে এ জাতি এ রকমের ইন্দ্রিয়বিলাসের ক্ষমতা রাখে না এবং আমাদের বৈষয়িক উপায় উপকরণের যে অবস্থা, তা এর অনুমতিও দেয় না। দুনিয়ার অন্যান্য জাতি অশ্লীলতা ও

নগ্নতা এবং ভোগপরায়ণতায় ভেসে গিয়ে দুনিয়ায় দুই দিনের মজা লুটতে চাইলে তা লুটতে পারে। কিন্তু আমরা তো মুসলিম উম্মাহ। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা আমাদের ভিত্তিমূল গঠিত। কোনো রকমের ভোগবাদ ও ইন্দ্রিয়সেবা এই ভিত্তিমূলের সাথে যায় না। কাজেই ভোগ-বিলাস, আনন্দ-ফুর্তি ও ইন্দ্রিয়বিলাসের পথ অবলম্বন করলে তাতে এ জাতির ধ্বংস-বিনাশ ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের চিন্তাজগতের নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন। আপনারা আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা-শ্রমের মাধ্যমে এ জাতিকে আখলাক চরিত্রের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন। এই নীতিতে কাজ করলে মানবতার সেবা করার সুবাদে এ জাতির যাবতীয় কৃতিত্ব আপনাদের আমলনামায় লেখা হতে পারে। এটা আপনাদের পদমর্যাদাগত দায়িত্ব যে নতুন প্রজন্ম কোনো ভুল পথ অবলম্বন করলে আপনারা নিজেদের হিকমত ও অন্তর্দৃষ্টি এবং মুহাব্বত ও মমত্বের সাথে তাদের গতিপথ বদলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কোনো রকম বিপথগামিতায় তাদের উৎসাহবর্ধনে ভূমিকা রাখা আপনাদের কাজ হতে পারে না। আপনাদের পূর্বসূরিগণ আপনাদের জন্য সম্ভ্রম ও মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা ও চরিত্রবত্তার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তা আপনারা আপনাদের সন্তানদের জন্য কী উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাচ্ছেন? নির্লজ্জতার? চরিত্রহীনতার? সম্ভ্রমহীনতার? নাকি হীনতা ও লাঞ্ছনার?

এ ধরনের অশ্লীল ও নগ্ন বিষয়বস্তু এবং এ জাতীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে তুচ্ছ বাড়তি রোজগার হয়ে থাকে, আপনাদের দৃষ্টি কেবল সেদিকে। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা করুন এসব যে নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন প্রজন্মের চরিত্র নষ্ট করছে এবং মন-মানসিকতা বরবাদ করছে তার বিপরীতে এই সামান্য বাড়তি রোজগার কি মনে প্রশান্তি ও আত্মায় স্বস্তি জোগাতে পারে? এই রোজগার এবং এর মাধ্যমে নির্মিত আয়েশি ঘরবাড়ি শেষ পর্যন্ত তো এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু এর যে ভয়াবহ পরিণাম আখেরাতে অপেক্ষা করছে এবং দুনিয়ায় এটা যে কুখ্যাতির জোগান দিচ্ছে, তা তো কখনো সঙ্গ ত্যাগের নয়। যত দিন দুনিয়া আছে, তত দিন এ কুখ্যাতিও থেকে যাবে আর আখেরাতের শাস্তি তো অনিঃশেষ। কোরআন মাজীদে ইরশাদ,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : স্মরণ রেখো, যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক–এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা নূর : ১৯)

সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে সংবাদপত্রের নীতিমালায় পুনর্বিবেচনা করুন। এতে চারিত্রিক অপরাধ সংক্রান্ত খবর, অশ্লীল বিষয়বস্তু ও নগ্ন বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করুন। সৎ ও স্বচ্ছ সাংবাদিকতার উৎকর্ষ সাধন করুন। জাতিকে নগ্নতার প্রতি আকৃষ্ট না করে তাদের মধ্যে জ্ঞান ও শ্লীলতা এবং সাধুচরিত্রের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করুন। তাদের ভেতরে এমন পরিপক্ব জাতীয় চেতনা জাগ্রত করুন, যা এ জাতিকে মূল্যবোধ, আত্মসচেতনতা নির্মাণ ও উন্নয়নের পথে ধাবিত করবে।

বর্তমানে যে অবস্থা চলছে, তার এটা বড় দায় সংবাদপত্রের পাঠকদের ওপরেও বর্তায়। এখন পর্যন্ত এই পাঠকদের সিংহভাগই এমন, যারা সংবাদপত্রের এ নীতিমালাকে আদৌ পছন্দ করে না। তারা মনে মনে এর প্রতি বেজায় নাখোশ। কিন্তু আফসোসের কথা হলো, আমরা আমাদের সব অসন্তোষ ভেতরে ভেতরেই হজম করে ফেলি, কদাচ প্রকাশ করলেও তা কেবলই নিজেদের একান্ত মজলিসে। বাইরে তা সহজে উচ্চারণ করি না। সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপকদের কাছে তা প্রকাশ করি না। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেও সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয় না। তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো চিঠিপত্রও পৌঁছে না। অন্য কোনো পন্থায়ও এ নীতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয় না।

আমাদের অনুরোধ, সংবাদপত্রের এ নীতিমালাকে যদি আপনারা অপছন্দই করে থাকেন এবং আপনাদের দৃষ্টিতে সাংবাদিকতার এ কর্মপন্থা আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে থাকে আর সে জন্য এই কচিমনাদের প্রতি আপনাদের কোনো দয়া-মায়া লেগে থাকে, তবে নিজেদের এই অনুভূতি আপনজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাংবাদিক মহলেও পৌঁছানো উচিত। বিশেষত তাদের মধ্যে যারা নীতিনির্ধারক, তাদের দৃষ্টি এদিকে অবশ্যই আকর্ষণ করা উচিত। আপনারা তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নাগরিক শ্রেণীর মধ্য থেকে প্রতিনিধিদল পাঠান, তাদের কাছে চিঠি লিখুন এবং তাদের কাছে দাবি জানান, তারা যে তাদের এ নীতি পরিবর্তন করে এবং সাংবাদিকতাকে এই নোংরামি থেকে বের করে আনে। এ কাজকে কেবল উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপরে ন্যস্ত রেখে নিশ্চিন্তে বসে থাকাটা কোনোভাবেই আখিরাতের জিম্মাদারি থেকে মুক্ত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই এর তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোরআন-হাদীস থাকতে মাযহাব কেন?-৯

খতীবে ইসলাম আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমরা নিম্নবিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করে এসেছি।

* লা-মাযহাবীদের ঐতিহাসিক পরিচয়।
* লা-মাযহাবীদের কালেমা বনাম মুসলমানদের কালেমা।
* লা-মাযহাবীদের আল্লাহ পৃথিবীর কোথাও নেই।
* লা-মাযহাবীদের নবী মুর্দা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের নবী জিন্দা।

এবারের বিষয় হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা লা-মাযহাবীদের কাছে নাজায়েয ও গোনাহের কাজ। এ বিষয়েও লা-মাযহাবীদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের আকীদা-বিশ্বাসের সাংঘর্ষিকতা সুস্পষ্ট। যা এদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

একজন মুসলমানের জীবনে হযরত রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার তা "হায়াতুন্নবী" আকীদায় বিশ্বাসী কোনো মুসলমানের জন্য খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্লেখ্য যে হায়াতুন্নবী আকীদার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু লা-মাযহাবীরা যেহেতু হায়াতুন্নবীতেই বিশ্বাসী নয়, তাই তারা তাদের ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত মরা (?) নবীর রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বলে থাকে যে রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েয বা গোনাহের কাজ। অর্থাৎ এদের একটি ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে আরেকটি ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। তাই রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বিষয়টিও দলিল-প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোচনা হওয়া দরকার।

রওযা শরীফ নামের তাৎপর্য

এর আগে আরেকটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সেটি হলো আজকাল কোনো কোনো লা-মাযহাবীদের বিবৃতিতে শুনতে পাওয়া যায় যে রাসূলের রওযা শরীফকে "রওযা শরীফ"ও বলা যাবে না। বরং রাসূলের কবর বলতে হবে। কারণ কোনো হাদীসে রাসূলের কবরকে রওযা শরীফ বলা হয়নি! এর দ্বারা বোঝা গেল এরা রাসূলের রওযা শরীফের যিয়ারতের প্রতিই শুধু অবজ্ঞাকারী নয়, বরং খোদ রওযা শরীফের নামটি শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করার প্রতিও চরম অবজ্ঞাকারী।

অথচ তিরমীযী শরীফের বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল বলেন,

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار

অর্থাৎ কবর জান্নাতের রওযা (অর্থাৎ জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান) অথবা জাহান্নামের কুণ্ডসমূহের একটি কুণ্ড। এ হাদীসটির সনদ যঈফ হলেও আরেকটি সহীহ হাদীসে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উল্লেখ আছে। সেই বিস্তারিত হাদীসটির একাংশ হচ্ছে,

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربى الله۔ فيقولان له ما دينك؟ فيقول دينى الاسلام۔ فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله (فيقولان ومايدريك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت فذالك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الاية۔) فينادى مناد من السماء ان صدق عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحواله بابا الى الجنة ويفتح له۔ الى اخرالحديث۔

অর্থাৎ কবর দেশে মুর্দার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন–তোমার রব কে? উত্তরে মুর্দা বলে–রব আমার আল্লাহ। আবার প্রশ্ন করেন–তোমার ধর্ম কী? উত্তরে সে বলে–ইসলাম। তারপর প্রশ্ন করেন–সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলো, যাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল? উত্তরে বলে–তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন আসমান হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণকে ডেকে বলা হয় আমার বান্দা ঠিকই বলেছে। তাই তাকে জান্নাতের বিছানা

বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। তখন তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। (আবু দাউদ শরীফ : ২৪৬০)

এ হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কবর দেশে মুনকার-নাকীর ফেরেশতার তিনটি প্রশ্নের জবাব যারা সঠিকভাবে দিতে পারে তাদের কবরে জান্নাতের সুখ-শান্তি উপভোগ করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এ জন্যই পূর্বোক্ত হাদীসে কবরকে জান্নাতের রওযা বা বাগান বলা হয়েছে। কাজেই পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ যঈফ হলেও শেষোক্ত সহীহ হাদীসে তার সমর্থন থাকায় প্রথমোক্ত হাদীস অমান্য করার সুযোগ নেই। এবার আমাদের কথা হচ্ছে, রাসূল যেখানে নেককার মুমিনের কবরকেই জান্নাতের রওযা বা বাগান সাব্যস্ত করে দিলেন, সেখানে স্বয়ং রাসূলের কবরকে রওযা শরীফ বলতে তারাই আপত্তি তুলতে পারে, যাদের কালেমা মুসলমানদের কালেমা থেকে ভিন্ন, যাদের আল্লাহ পৃথিবীর কোথাও নেই, যাদের নবী কবরে জীবিত নন। সর্বোপরি যারা উপমহাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মীরজাফরের ভূমিকায় ইতিহাস কুখ্যাত ছিল।

উপরোক্ত হাদীসের শেষের দিকেত রাসূল ওই সমস্ত লোকের কবরকে জান্নাতের রওযা সাব্যস্ত না করে জাহান্নামের কুণ্ড সাব্যস্ত করেছেন, যারা প্রশ্ন তিনটির জবাব দিতে পারবে না। তাহলে স্বয়ং রাসূলের কবরকে যারা রওযা মানতে রাজি নয়, তারা রাসূলের কবরের অবস্থা কী বলতে চায়? যে রাসূলকে রাসূল বলে স্বীকৃতি দিতে পারলে উম্মতের কবরই জান্নাতের রওযা হয়ে যায়, স্বয়ং সেই রাসূলের কবরকে লা-মাযহাবীরা কোন দৃষ্টিতে দেখতে চায়? তাঁর কবরকে রওযা শরীফ বলাতে এত গাত্রদাহ কেন?

লা-মাযহাবীদের মাযহাব

মাযহাব শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে শুধু এতটুকু উল্লেখ থাকা দরকার যে, যেকোনো বিশেষ দল বা ব্যক্তি বিশেষের মতাদর্শ ও অনুসৃত পথকেই পরিভাষাগতভাবে মাযহাব বলা হয়। লা-মাযহাবীরা ইসলামের প্রসিদ্ধ মাযহাব চারটি মানে না। এ হিসেবে তারা লা-মাযহাবী। কিন্তু চার মাযহাবের বাইরে তারা বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের মত ও পথ অবশ্যই মানে। সে হিসেবে লা-মাযহাবীদেরও কোনো না কোনো মাযহাব আছে। যদিও তা ভ্রান্ত মাযহাব। এ হিসেবেই শিরোনামে "লা-মাযহাবীদের মাযহাব" বলা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ে লা-মাযহাবীদের মাযহাব হলো রাসূলের রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েয, অর্থাৎ গোনাহের কাজ! (নাউযুবিল্লাহ!)

লা-মাযহাবীদের দলিলের ভ্রান্তি

যে হাদীসের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় লা-মাযহাবীরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদটি উদ্ভাবন করেছে, সে হাদীসে রাসূল বলেন,

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى

অর্থাৎ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা–এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ছাড়া সফর করা যাবে না।

আরবী গ্রামার অনুপাতে এ হাদীসের বরাতে দুটি শব্দ (مستثنى منه) উহ্য আছে। তা হলো "الى مسجد" এবং উহ্য শব্দ দুটির অর্থ হলো কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে। তখন হাদীসটির মর্ম দাঁড়ায় উল্লিখিত মসজিদ তিনটি ছাড়া আর কোনো মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে "সফর"-এর মতো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা অনর্থক। কারণ এ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য সকল মসজিদে নামায পড়ার সাওয়াব সমান। (অবশ্য কুবা মসজিদের কথা এ হাদীসে উল্লেখ না করার কারণ হলো মসজিদে নববী থেকে কুবা মসজিদ অতি নিকটে হওয়ায় এর উদ্দেশ্যে আলাদা সফরের প্রয়োজন হয় না।

আলোচ্য হাদীসের এ মর্মই উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সূচনাকাল থেকে অনুসৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু সর্বপ্রথমে এর ব্যতিক্রম ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করেন কাজী ইয়াজ মালেকী। (তিরমীযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ দরসে তিরমিযী : ২/৮২)। তিনি মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিপরীতে বলেন, আলোচ্য হাদীসের বরাতে উহ্য শব্দ দুটি الى مسجد নয়, বরং তা হলো الى شئ। তখন হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় উল্লিখিত তিনটি মসজিদ ছাড়া কোনো কিছুর উদ্দেশ্যেই সফর করা যাবে না। অথচ এ অর্থটি যে কত বড় ভুল তা কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। কারণ এ অর্থ গ্রহণ করলে ব্যবসায়ের জন্য সফর করা, প্রবাসী পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্য সফর করা, চিকিৎসার জন্য সফর করা, জিহাদের জন্য সফর করা, এমনকি কোরআন-হাদীসের ইলম শিক্ষার জন্য সফর করাও নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে; যা সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। তাই

আলোচ্য হাদীসের এ ব্যাখ্যা বাতিল। এই বাতিল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কাজী ইয়াজ ফাতাওয়া দিয়েছিলেন যে, কোনো কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সফর শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভ্রমণ। আর ইসলামী বিধান শাস্ত্রের পরিভাষায় নিজ ঠিকানা থেকে কমপক্ষে ৪৮ মাইল বা ৭৮ কিলোমিটার দূরে পনেরো দিনের কম সময় অবস্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাকে সফর বলা হয়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বাড়াবাড়ি

আলোচ্য হাদীসের সেই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার আশ্রয়ে কাজী ইয়াজের উক্ত ফাতাওয়ার ভিত্তিতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আরো বাড়াবাড়ি এবং কঠোরতা অবলম্বন করে বলেন যে, স্বয়ং রাসূলের রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েয! তিনি বলেন, যদি কেউ মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে সফর করে মদীনা শরীফে যায় আর এই সুযোগে তখন রওযা শরীফও যিয়ারত করে নেয়, তবেই শুধু তার যিয়ারত জায়েয হবে। কিন্তু পূর্ব থেকেই রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়। তাঁর এ বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার প্রতিবাদে আল্লামা তকীউদ্দীন সুবকী 'শিফাউস সিকাম" নামে বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কিতাব লেখেছেন। (তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ দারসে তিরমিযী : ২/৮২)

ইবনে তাইমিয়ার ইলমী যোগ্যতা অনেক বেশি ছিল। যে কারণে বিশ্বের বহু আলেম তাঁকে আল্লামা উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু বাংলায় একটি প্রবাদ আছে "হাতিরও ধসে পাও, সুজনেরও ডুবে নাও"। সেই অনুপাতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া নিজের ইলমী যোগ্যতার ওপর অতিরিক্ত আস্থাশীল হয়ে তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্তকৃত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতঃ উম্মতের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে গেছেন। সে সমস্ত বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে আলোচ্য হাদীসের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার আশ্রয়ে রাসূল (সা.)-এর রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে নাজায়েজ বলা। কাজেই আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর যেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তার পূর্ববর্তী উম্মতে মুসলিমার সিদ্ধান্তের বিপরীত, সেগুলি জমহুরে আহলে সুন্নাত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের সিংহভাগ মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আলোচ্য হাদীসের সহীহ ব্যাখ্যা

যে হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার উদ্দেশ্যে ছাড়া সফর করা যাবে না; সে হাদীসে লা-মাযহাবীদের পক্ষে কোনো দলিল নেই। কারণ :

১। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ হাদীসকে যদি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, এ তিন মসজিদ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যেই সফর করা যাবে না, তাহলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সফরসহ মানবজীবনের যাবতীয় সফর নিষিদ্ধতার আওতায় চলে যায়। আর এটা যে বাতিল, তা কোনো বিবেকবানকে খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এ হাদীসে লা-মাযহাবীদের পক্ষে কোনো দলিল নেই।

২। এ কথাও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসের সহীহ ব্যাখ্যা হলো উল্লিখিত তিন মসজিদ ছাড়া আর কোনো মসজিদে নামায পড়ার যেহেতু আলাদা কোনো ফযীলত নেই, তাই অন্য কোনো মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফরের কষ্ট স্বীকার করার কোনো স্বার্থকতা নেই। কাজেই এমন অনর্থক সফর করতে রাসূল নিষেধ করেছেন। সুতরাং অন্যান্য সফর এ নিষিদ্ধতার আওতায় আসে না। এ জন্যই রাসূলের রওযা শরীফ যিয়ারতের সফরত দূরের কথা, কোনো ওলী-আউলিয়ার মাজার যিয়ারতের সফরও এ নিষিদ্ধতার আওতায় আসে না।

প্রচলিত "ওরস"-এর উদ্দেশ্যে সফর করা অবশ্যই নাজায়েয

তবে যে সমস্ত ভণ্ডপীর ও তাদের ভক্ত মুরীদান বিভিন্ন মাজারে গিয়ে ওরসের নামে অনুষ্ঠান করতঃ মা'রেফাতের দোহাই তোলে গান-বাজনা করে, মাজারকে তাওয়াফ করে, সিজদা করে, মাজারে সমাধীস্থ তাদের "বাবা"র কাছে ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি ও সন্তানাদি চায়-এসব কর্মকাণ্ডের কোনোটা কুসংস্কার, কোনোটা বিদ'আত, আর কোনোটা কুফর এবং শিরক। এ সমস্ত শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য সফর করা অবশ্যই জায়েয নয়; যেভাবে চুরি-ডাকাতির জন্য সফর করা জায়েয নয়। এর সাথে কোনো পুণ্যবানের মাজারে শুধু যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ প্রথমটি হলো গোনাহর কাজে সফর, আর দ্বিতীয়টি হলো সাওয়াবের কাজের সফর। এত সহজ-সরল পার্থক্যটা যারা বোঝে না, তারা কি আসলেই বোঝে না? না নিজেদের ভ্রান্তমতে হঠকারিতার মাধ্যমে অটল থাকার অপকৌশল হিসেবে না বোঝার ভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আরেকটি হাদীস

৩। জমহুরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আলোচ্য হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন সে ব্যাখ্যার পক্ষে আরেকটি হাদীসও আছে, যাতে রাসূল বলেন,

لا ينبغى للمطى ان يشد رحاله الى مسجد يبتغى فيه الصلوة غير مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا۔

অর্থাৎ কোনো মুসাফিরের জন্য মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং আমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো

মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করা উচিত নয়। (উমদাতুল কারী শরহে বোখারী : ৩/৬৮২-৬৮৩ এবং ফাতহুল বারী শরহে বোখারী : ৩/৫৩ এর বরাতে দারসে তিরমিযী : ২/৮২)

এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজনের নাম শাহর বিন হাওশাব। তিনি হাদীসের বর্ণনায় যঈফ বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এমন অভিযোগ পেলেই লা-মাযহাবীরা হাদীসটি উড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরে করা হবে। আপাতত এখানে শুধু দুটি কথা লক্ষণীয়। যথা :

(ক) বর্ণনাকারী হাদীসের বর্ণনায় অযোগ্য সাব্যস্ত হলে তার বর্ণিত হাদীস কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না। হ্যাঁ বর্ণনাকারী অযোগ্য না হয়ে তার যোগ্যতায় দুর্বলতা থাকলে তার বর্ণিত হাদীসকেই যঈফ হাদীস বলা হয়। ইলমে হাদীসের পরিভাষায় এমন যঈফ হাদীস ও রাসূলের হাদীস বলেই গণ্য।

তাই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর না করার হাদীসটি যদি যঈফও হয়, তবু সেটা রাসূলের হাদীস। শুধু যঈফ হওয়ার কারণেই যদি হাদীসটি গ্রহণযোগ্য না হয়ে উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী ইবনে তাইমিয়ার কথা গ্রহণ করতে হয়, তাহলে কি ইবনে তাইমিয়ার কথা রাসূলের যঈফ হাদীসের চেয়েও বেশি গ্রহণযোগ্য? যদি তাই হয়, তাহলে যে বিষয়ে রাসূলের কোনো যঈফ হাদীসও পাওয়া না যায়, সে বিষয়ে মাযহাবের ইমামগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা বিদ'আত এবং শিরক হবে কেন? আর তাদের ব্যাখ্যা মানা যদি বিদ'আত ও শিরকই হয়, তাহলে রাসূলের হাদীসের বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়ার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা বিদ'আত শিরক হবে না কেন?

(খ) আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন,

شهر بن حوشب وثقه جماعة من المسلمين

অর্থাৎ ইমামদের একটি দল শাহ্‌র বিন হাওশাবকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর আল্লামা ইবনে হাজার (রহ.) বলেন,

وشهر حسن الحديث وان كان فيه بعض الضعف

অর্থাৎ শাহ্‌র বিন হাওশাবের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। এ কারণে তার বর্ণিত হাদীস (যঈফ নয়) হাসান। (দারসে তিরমিযী : ২/৮২)

উল্লেখ্য যে, হাসান হাদীসের দ্বারা আমল প্রমাণিত হয়। আর রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা একটি আমল। তাই এটা প্রমাণের জন্য হাসান হাদীস যথেষ্ট।

হাদীসের বিবরণে রওযা শরীফ যিয়ারতের গুরুত্ব

১। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

من زار قبرى وجبت له شفاعتى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (আল জামিউস সগীর : ২/১৭১-এর বরাতে দারসে তিরমিযী : ২/৮৩)

হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটিকে আল্লামা সূয়ূতী (রহ.) যঈফ বলেছেন। কিন্তু আল্লামা নিমাবী (রহ.) এ হাদীসটিকে ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করতঃ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং যঈফ বলে যে মন্তব্য রয়েছে তার সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেছেন। আর হাসান হাদীসের দ্বারা যে আমল প্রমাণিত হয় তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

عن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قبرى او قال من زارنى كنت له شفيعا او شهيدا۔ الحديث

অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য শাফায়াতকারী হবো।' (মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী। ১/১২-১৩ এবং আল-মাত্বালিবুল আলিয়া : ১২৫৩।) এ হাদীসের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতঃ শায়খ হাবিবুর রহমান আযমী বলেন, এ হাদীসের সমর্থনে আবু ইয়ালা ও তাবারানীর সূত্রে সহীহ সনদের বিবরণ রয়েছে। (দ্রঃ দারসে তিরমিযী : ২/৮৩)

৩। আল্লামা নিমাবী আসারুস্ সুনান : ২৭৯-এ হযরত আবু দারদা (রা.)-এর বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন,

ان بلالا رأى فى منامه رسول الله

صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ما هذا الجفوة يا بلال اما ان لك ان تزورنى يا بلال فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة فاتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فجعل يبكى عنده ويمرغ وجهه عليه۔ الحديث۔

অর্থাৎ হযরত বিলাল (রা.) স্বপ্নে দেখেন, রাসূল (সা.) তাঁকে বলছেন, হে বিলাল! একি অবিচার? এখনো তুমি আমার যিয়ারতে আসার সময় হয়নি? এ স্বপ্ন দেখে বিলাল (রা.) চিন্তিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বাহনে সওয়ার হয়ে মদীনা শরীফ গেলেন। তারপর রওযা শরীফে এসে কাঁদতে লাগলেন এবং অত্যধিক অনুশোচনার কারণে চেহারায় বালি মাখতে লাগলেন।

এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা সুবকী (রহ.) বলেন, এর সনদ উত্তম। অর্থাৎ নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। (দারসে তিরমিযী : ২/৮৩)

৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

من حج ولم يزرنى فقد جفانى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ করল অথচ আমার রওযা যিয়ারত করল না, সে আমার সাথে অবিচার করল।

হাদীসটি যঈফ। (দারসে তিরমিযী : ২/৮৩-এর পার্শ্বটীকা) ব্যস! এতটুকু মন্তব্য পেলেই তো লা-মাযহাবীরা এই বলে হৈচৈ শুরু করে দেয় যে, "যঈফ হাদীস মানি না, যঈফ হাদীস মানি না।" রওযা শরীফ যিয়ারত সংক্রান্ত প্রায় সব হাদীসের ব্যাপারে লা-মাযহাবীরা এই হাতিয়ারটাই ব্যবহার করে থাকে। তাই এখানে যঈফ হাদীস মানা না মানার ব্যাপারটাও একটু পরিষ্কারভাবে আলোচনা হওয়া দরকার।

রওযা শরীফ যিয়ারত সংক্রান্ত যঈফ হাদীস মানব কেন?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যঈফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দুর্বল। এ অর্থে রাসূলের কোনো কথাকে যঈফ বলার অর্থ দাঁড়ায় রাসূলের কথাটি দুর্বল! অথচ এমন কথা কোনো মুসলমান কখনো বিশ্বাস করে না যে রাসূল উম্মতের হেদায়েতের জন্য কোনো দিন কোনো দুর্বল কথা বলেছেন। তাহলে কোনো হাদীসকে যঈফ বলা হয় কোন অর্থে? আভিধানিক অর্থে নয়। বরং এটা ইলমে হাদীসের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ রাসূলের কথা দুর্বল নয়, বরং হাদীসটির বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার যোগ্যতায় দুর্বল। এই হচ্ছে কোনো হাদীসকে যঈফ বলার মর্ম।

এ কথাও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাসূলের হাদীস, সহীহ, হাসান এবং যঈফ–এ তিনটি পরিভাষায় বিভক্ত হয় শুধুমাত্র হাদীসের বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে। যোগ্যতা উত্তম হলে তাদের বর্ণিত হাদীসকে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় সহীহ হাদীস; যোগ্যতা মধ্যম হলে তাদের বর্ণিত হাদীসকে হাসান হাদীস এবং যোগ্যতা নিম্নমানের হলে তাদের বর্ণিত হাদীসকে যঈফ হাদীস বলা হয়। যারা ইলমে হাদীসের পরিভাষা বোঝেন না তাদের জন্য এর চেয়ে বেশি সংক্ষেপে বলার উপায় নেই। আর যারা বাংলা ভাষায়ই পরিভাষাগুলি বিস্তারিত বুঝতে চান তাঁরা হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমী (রহ.)-এর লিখিত "হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস" নামক গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

পাল্টা অভিযোগমূলক জবাব

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অথবা তাঁর কোনো সাহাবী সহীহ হাদীস মতে আমল করতে হবে এবং যঈফ হাদীস মতে আমল করা যাবে না; এমন কথা বলবেন দূরের কথা, কোনো হাদীসকে সহীহ যঈফ ইত্যাদি পর্যন্ত বলেননি। বরং রাসূলের হাদীসের বেলায় এ সমস্ত পরিভাষার প্রয়োগ পরবর্তীকালের উদ্ভাবন। এখন যদি এ সমস্ত পরিভাষার বিধানমতে রাসূলের হাদীস মানতে হয়, তাহলে পরবর্তীকালের উদ্ভাবিত মাযহাবের পরিভাষা মতে ইসলামের বিধান মানা যাবে না কেন? মাযহাবের বেলায় যদি প্রশ্ন আসে যে রাসূলের কথার পরিবর্তে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কথা মানব কেন; তাহলে রাসূল যে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজে এসে আমার যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি অবিচার করল।' এর পরিবর্তে যারা হাদীসটিকে যঈফ বলেছে, তাদের কথা মানব কেন?

'রাসূলের কথা মানব না, আবু হানীফার কথা মানব?'–এমন প্রশ্ন তুলে যারা মাযহাব মানাকে বিদ'আত শিরক বলে, তাদের কাছে জিজ্ঞাস্য যে রওযা শরীফ যিয়ারতে রাসূলের কথার পরিবর্তে ইবনে তাইমিয়ার কথা মানলে বিদ'আত বা শিরক হবে না কেন? আর ইবনে তাইমিয়ার কথা মানলে যদি বিদ'আত শিরক না হয়, তাহলে আবু হানীফার কথা মানলে বিদ'আত শিরক হবে কেন? আমার প্রশ্নের যেই জবাব,

তাদের প্রশ্নেরও সেই জবাব।

আসল জবাব

আসল ব্যাপার হচ্ছে রাসূল এবং তাঁর সাহাবাগণের পরবর্তী যুগের অবস্থার প্রেক্ষিতে যেমনভাবে রাসূলের হাদীসগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিন্যস্তকরণের জন্য এ সমস্ত পরিভাষার উদ্ভাবন ছাড়া উপায় ছিল না, তেমনিভাবে তাঁদের পরবর্তী যুগে কোরআন-হাদীসে বর্ণিত ইসলামী বিধানসমূহের সংরক্ষণ ও বিন্যস্তকরণের জন্য মাযহাব চতুষ্টয়ের উদ্ভাবন এবং বিধান শাস্ত্রের পরিভাষাগুলি নির্ধারণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাই এটাও বিদ'আত নয়, সেটাও বিদ'আত নয়। কারণ কোরআন-হাদীসের দ্বারা যেসব করণীয় ও বর্জনীয় সাব্যস্ত হয় সেগুলিতে রদবদল করার নাম বিদ'আত। পক্ষান্তরে কোরআন-হাদীস ও এতদভয়ের দ্বারা সাব্যস্তকৃত বিধানাবলির সংরক্ষণ ও বিন্যস্তকরণ ব্যবস্থার নাম বিদ'আত নয়। এর সহজ উদাহরণ হচ্ছে নামাযের জামাতে কাতার সোজা করা হাদীসের দ্বারা সাব্যস্তকৃত বিধান। এতে রদবদল করা বিদ'আত। কিন্তু এর ব্যবস্থা হিসেবে মসজিদের ফ্লোরে সোজা করে দাগ দেওয়া বিদ'আত নয়। কারণ এটা হলো বিধান পালনের ব্যবস্থা।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে হাদীস চর্চাকারীগণ তার পরিভাষাগুলি উদ্ভাবন করার সাথে এ নীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ হবে সহীহ হাদীসের দ্বারা, ইসলামী আমল প্রমাণের জন্য হাসান হাদীসও যথেষ্ট হবে এবং কোনো আমলের ফযীলত এবং যাওয়াইদাতে দ্বীন (অর্থাৎ ঐচ্ছিকভাবে পালনীয় বিধানগুলো) প্রমাণের জন্য যঈফ হাদীস যথেষ্ট হবে। যঈফ হাদীস যতক্ষণ পর্যন্ত যঈফ হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা কোনো আকীদা-বিশ্বাস বা জরুরিয়াতে দ্বীন (অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় বিধানগুলো) প্রমাণিত হবে না। এ নীতিটাও কোরআন-হাদীসে থাকবে দূরের কথা, রাসূলের বা তাঁর কোনো সাহাবীর দ্বারা নির্ণিত নয়। কারণ তাঁদের যুগে কোন হাদীস সহীহ, হাসান এবং যঈফে বিভক্তই ছিল না। অথচ কোনো মাযহাবের ইমাম বা তাঁদের অনুসারীগণ এ কথা বলেন না যে, যঈফ হাদীসের দ্বারা কোনো আকীদা বা জরুরি আমল প্রমাণিত না হওয়ার বিধান যেহেতু রাসূল এবং সাহাবাগণের যুগে ছিল না, তাই আমরা এ বিধান মানব না। বরং সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন।

ঠিক তেমনিভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে ইলমে হাদীসের সহীহ যঈফ ইত্যাদি পরিভাষা এবং সেগুলি দলিল হওয়া না হওয়ার নীতি রাসূল এবং তাঁর সাহাবাগণের পরবর্তী যুগে প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারীগণ তা মেনে নিয়েছেন। সেই একই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে মাযহাব চতুষ্টয় এবং ইলমে ফেকাহর পরিভাষাগুলিও পরবর্তী যুগের উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সারা দুনিয়ার হকপন্থী মুসলমান মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সেখানে বেঁকে বসেছিল "আহলে কোরআন" নামধারী বাতিলপন্থীরা। আর এখানে এসে বেঁকে বসেছে আহলে হাদীস নামধারী বাতিলপন্থীরা। এখানে তারা যেভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, পরবর্তী যুগের উদ্ভাবিত মাযহাব আমরা মানব কেন? তেমনিভাবে আমরাও তো সেখানে প্রশ্ন করতে পারতাম যে পরবর্তী যুগের উদ্ভাবিত সহীহ যঈফ ইত্যাদি পরিভাষা আমরা মানব কেন? কিন্তু তা না করে আমরা যেভাবে মাযহাব এবং ইলমে ফেকাহের পরিভাষাগুলি মেনে নিয়েছি, তেমনিভাবে ইলমে হাদীসের পরিভাষাগুলিও আমরা মেনে নিয়েছি।

সুতরাং কেউ যদি আমাদের প্রশ্ন করে যে মাযহাব মানতে হবে কেন? তাহলে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যেভাবে আমাদের দায়িত্ব, তেমনিভাবে যদি কেউ আমাদের প্রশ্ন করে যে, যঈফ হাদীসের দ্বারা রওযা শরীফ যিয়ারতের আমল প্রমাণ হয় কিভাবে? তাহলে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়াকেও আমাদের দায়িত্ব মনে করি।

প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে কোনো যঈফ হাদীস যদি কোরআনের কোনো আয়াতের অথবা সহীহ কিংবা হাসান হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে যেহেতু উক্ত যঈফ হাদীসটির বিপরীতে এর চেয়ে আরো শক্তিশালী দলিল বিদ্যমান, তাই এমন যঈফ হাদীস আর আমলযোগ্য থাকে না। এমন যঈফ হাদীসের ব্যাপারে এ কথাই বুঝে নিতে হবে যে, হাদীসটির বর্ণনাকারীর যোগ্যতা এতই দুর্বল যে, তিনি বিষয়টি সঠিকভাবে সংরক্ষণ বা স্মরণ রাখতে পারেননি। আর যে যঈফ হাদীস এমন সাংঘর্ষিক নয় এবং এমন যঈফ হাদীসটির কোনো বর্ণনাকারী যদি আহলে হাদীসগণের যাচাইয়ে "মাতরক", "মুত্তাহাম বিল কিযব" অথবা "মুনকার" সাব্যস্ত না হন তাহলে তা সত্যিকারের আহলে হাদীস (যাদের পরিচয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।) গণের

কাছে বহু ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

মুস্তাহাব আমলের বেলায় যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য

পৃথিবীবিখ্যাত বিশাল একটি হাদীসগ্রন্থ "মুসনাদে আহমদ"। এর সংকলক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তাঁর ছেলেকে সম্বোধন করে বলেন,

يا بنى تعرف طريقتى فى الحديث لست اخالف ما ضعف اذا لم يكن فى الباب ما يدفعه۔

অর্থাৎ হে আমার প্রিয় ছেলে! তুমি তো আমার নিয়ম জানো যে কোনো যঈফ হাদীসের সাথে কোনো সাংঘর্ষিক হাদীস না থাকলে আমি যঈফ হাদীসের বিরোধিতা করি না। (আল মাওসূ'আতুল হাদীসিয়া : ১/৭০-এর বরাতে "যঈফ হাদীস মানা যাবে কি?" : ১৪৫)

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) (মৃত্যু ৮৬১ হি.) বলেন,

الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع

অর্থাৎ যঈফ হাদীসের দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়; মওযু হাদীসের দ্বারা এটা হয় না। (ফাতহুল কাদীর : ১/৮৬৮-এর বরাতে "যঈফ হাদীস মানা যাবে কি?" : ১৪৬)

এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার পরিষ্কার উক্তিগুলি সবিস্তারে উল্লেখ করতে হলে আলাদা পুস্তক সংকলনের দরকার। এ দরকার অনেকাংশেই পূর্ণ করে দিয়েছেন ঢাকাস্থ মারকাযুস্ সুন্নাহ ওয়াদ দা'ওয়া'র মুহতামিম মাওলানা শামছুল হক সাহেব তাঁর লিখিত পুস্তক "যঈফ হাদীস মানা যাবে কি?"-এর মাধ্যমে। তাই বিষয়টি যাঁরা বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চান তাঁরা সেই পুস্তকটি দেখতে পারেন।

এখানে সংক্ষেপকরণার্থে সেই পুস্তক থেকে দু-একটি বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে। ইমাম নববী (মৃত্যু ৬৭৫ হি.) বলেন,

يجوز عند اهل الحديث التساهل فى الاسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله والاحكام۔

অর্থাৎ প্রকৃত আহলে হাদীসগণের দৃষ্টিতে মওযু হাদীস ছাড়া যঈফ হাদীসসমূহের সনদের প্রতি নমনীয়তা অবলম্বন করা; যঈফ হওয়ার বিষয়টা উল্লেখ না করেই যঈফ হাদীস বর্ণনা করা এবং যঈফ হাদীস আমল করা জায়েয। যতক্ষণ পর্যন্ত যঈফ হাদীসগুলি আল্লাহর গুণাবলি (অর্থাৎ আকীদাসংক্রান্ত) অথবা বিধি-বিধান (অর্থাৎ জরুরিয়াতে দ্বীনসংক্রান্ত) বিবরণসম্বলিত না হয়। (আত্ তাকরীর মাআ শরহিহিত্ তাহযীব : ১৯২-এর বরাতে যঈফ হাদীস মানা যাবে কি? ১৫৭-৫৮)

এ ব্যাপারে আরো চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ.)-এর বিবরণে। তিনি বলেন,

فضائل الاعمال الثابتة والمندوبات التى يثاب فاعليها ولا يذم تاركها فانه يجوز فيها اخذ الحديث الضعيف والعمل به لانه ان كان صحيحا فى نفس الامر فقد اعطى حقه من العمل والا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولاتحريم ولاضياع حق للغير۔

অর্থাৎ প্রমাণিত আমলসমূহের ফযীলতের বিবরণে এবং মুস্তাহাব আমলসমূহ যেগুলি করলে সাওয়াব আছে কিন্তু না করলে দোষ নেই, সেগুলোর ব্যাপারে যঈফ হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করা এবং যঈফ হাদীস আমল করা জায়েয। কারণ এটা যদি বাস্তবে সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে এটা আমল করার মাধ্যমে তার হক আদায় করা হলো। আর যদি এটা বাস্তবেই যঈফ হয়ে থাকে তাহলে এটা আমল করার মাধ্যমে কোনো হারামকে হালালও করা হয় না এবং কোনো হালালকে হারামও করা হয় না, আর অন্য লোকের হকও নষ্ট করা হয় না। (যফরুল আমানী : ১৮৬-এর বরাতে যঈফ হাদীস মানা যাবে কি?)

প্রকৃত আহলে হাদীসগণের দৃষ্টিতে ঐচ্ছিক পর্যায়ের নেক আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণটি এখানে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে। বিষয়টি সম্মানিত পাঠকগণের অনুধাবন হলে এবার আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়টি অনায়াসেই বুঝে আসবে। অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর রওযা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ইসলামের বিধানে বাধ্যতামূলক কোনো আমল নয়; বরং এটা হচ্ছে ঐচ্ছিক আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর এমন আমল প্রকৃত আহলে হাদীসগণের কাছে যঈফ হাদীস দ্বারাই প্রমাণ হয়। সুতরাং লা-মাযহাবীদের আহলে হাদীস নাম ধারণ করা একদিকে জ্বলন্ত মিথ্যাচার, অন্যদিকে রওযা শরীফ যিয়ারতের সফরের পক্ষে বর্ণিত যঈফ হাদীসকে অমান্য করা এদের আহলে হাদীস নামের কলঙ্ক এবং নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছু নয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

যাকাত : আহকাম ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

যাকাতের সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত বলা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিশেষ সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

এভাবেও বলা যেতে পারে, যাকাত এমন হক তথা অধিকারের নাম, যা বিশেষ বিশেষ ধন-সম্পদে ফরয হয় এবং বিশেষ শ্রেণীর লোক ও খাতে ব্যয় হয়।

হুকুম

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। যাকাত ফরয হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেলে একজন মুসলমানের ওপর যাকাত আদায় করা ফরযে আইন এবং এর অস্বীকারকারী ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।

যাকাত প্রদানের ফজীলত

যাকাত প্রদানের ফজীলতসংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

حصنوا اموالكم بالزكوٰة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء

তোমরা তোমাদের সম্পদকে বিপদমুক্ত রাখো যাকাত প্রদানের মাধ্যমে। আর দান-সদকার মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা করো। যেকোনো বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য দু'আর প্রতি গুরুত্বারোপ করো। (তাবরানী)

২। হযরত জাবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اذا اديت زكوة مالك فقد اذهبت عنك شره

যখন তুমি মালের যাকাত আদায় করলে তখন তুমি তার অনিষ্টকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিলে। (ইবনে খুযাইমা)

৩। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ان من تمام اسلامكم ان تؤدوا زكوة اموالكم

তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নিদর্শন হলো মালের যাকাত প্রদান করা। (তাবরানী)

৪। আরেক হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

برئ من الشح من ادى الزكوة

যাকাত প্রদানকারী কৃপণতামুক্ত। (তাবরানী)

৫। হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لايقبل الله صلاة رجل لا يؤدى الزكوة حتى يجمعهما فان الله تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما

যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না আল্লাহ তা'আলা তার নামায কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উভয়টি আদায় না করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতএব তোমরা কার্যক্ষেত্রে এ দুটির মাঝে বিভাজন তৈরি করো না। (কানযুল উম্মাল ১৫৭৮৪)

অনাদায়ে শাস্তি

ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত অনাদায়ীর জন্য রয়েছে শাস্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর তা দ্বারা তাদের কপালে তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে তার মজা ভোগ করো। (সূরা তাওবা, আয়াত নং ৩৪, ৩৫)

যাকাত প্রদান না করলে ভয়াবহ শাস্তির কথা অসংখ্য হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

من اتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان

يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك

আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে তার যাকাত প্রদান করল না তাহলে কিয়ামতের দিন ওই সম্পদকে বিষাক্ত সাপের রূপ দেওয়া হবে। যার চোখের ওপর থাকবে দুটি কালো চিহ্ন। কিয়ামতের দিন এই সাপ তাকে পেঁচিয়ে ধরবে অতঃপর সে তাকে দংশন করবে আর বলতে থাকবে, আমি তোমার সাধের মাল ও রক্ষিত সম্পদ। (বুখারী)

২। ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لم يمنع قوم زكوٰة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا

যে জাতি যাকাত প্রদান করবে না তারা অনাবৃষ্টিতে পতিত হবে, যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকত তাহলে তারা অনাবৃষ্টিতেই থাকত। (তাবরানী)

৩। হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما تلف مال فى بر ولا بحر الا بحبس الزكوٰة

জলে ও স্থলে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার একমাত্র কারণ যাকাত প্রদান না করা। (মুসনাদে তায়ালেসী)

৪। হযরত বুরায়দা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما منع قوم الزكوٰة الا ابتلاهم الله بالسنين

যে জাতি যাকাত প্রদান করবে না আল্লাহ তা'আলা তাদের দুর্ভিক্ষে পতিত করবেন। (মুসনাদে তায়ালেসী)

৫। আদী বিন হাতেম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

يوشك ان يأتى على الناس زمان يشق على الرجل ان يخرج فيه زكوة ماله

একটি সময় আসবে, যখন মানুষ সম্পদের যাকাত প্রদান করাকে কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে করবে। (তাবরানী)

যাকাত ফরয হওয়ার ভিত্তি

যাকাত ফরয হওয়ার মূল ভিত্তি হলো, বর্ধনশীল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া।

যাকাতের শর্ত

শর্ত দুই ভাগে বিভক্ত :

১. ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

২. আদায় সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

এক. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং পরাধীন গোলাম বান্দির ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

দুই. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিম ও মুরতাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

তিন. বালেগ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। উল্লেখ্য, সদকায়ে ফিতর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপরও ওয়াজিব।

চার. বুদ্ধি ও বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া। অতএব পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

পাঁচ. ধন-সম্পদ যাকাতের উপযোগী হতে হবে। এ ধরনের সম্পদের একটি মৌলিক সূচি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. স্বর্ণ।

২. রুপা।

৩. দেশি-বিদেশি কারেন্সি।

৪. ব্যবসায়িক পণ্য। (এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরে উল্লেখ করা হবে।)

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদি।

৬. গৃহপালিত পশু, যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে।

৭. খনিজ সম্পদ

ছয়. সম্পদ নিসাবের পরিমাণ হওয়া বা নিসাবের সমমূল্যের হওয়া।

যাকাতের রুকন

যাকাতের রুকন হলো, নিসাবের নির্দিষ্ট একটি অংশকে নিজের মালিকানামুক্ত করে যাকাত নেওয়ার উপযোগী কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া, বা তার প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করা। (বাদায়ে ২/৩৯)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যাবতীয় শর্ত পুরোপুরি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। শরয়ী কারণ ছাড়া আদায়ে বিলম্ব করা গোনাহ। (শামী ২/২৭১-২৭২, ফতহুল কদীর ২/১৬৫-১৬৬)

কতবার আদায় করতে হবে

ক. স্বর্ণ, রুপা, মুদ্রা, গবাদি পশু ও ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত বছরে একবার।

খ. শস্য ও ফলফলাদি যতবার উৎপন্ন হবে, ততবার। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৬৪)

অগ্রিম যাকাত প্রদান

ক. নিসাবের মালিক হওয়া ছাড়া অগ্রিম

যাকাত প্রদান করলে তা যাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

খ. নিসাবের মালিক হয়ে বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। (বাদায়ে ২/৫০)

সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে

ক. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর বিনা কারণে যে পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে ততটুকুর যাকাত মাফ হয়ে যাবে। পুরো ধ্বংস হলে পুরোটাই রহিত হয়ে যাবে।

খ. ইচ্ছাকৃত ধ্বংস বা নষ্ট করলে হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না। বরং পুরো হিসাব মোতাবেক যাকাত দিতে হবে। (ফতহুল কদীর ২/১৭৯)

নিসাবের বিবরণ

ক. স্বর্ণ ৭.৫ তোলা = ৮৭.৪৮০ গ্রাম।

খ. রুপা ৫২.৫ তোলা = ৬১২.৩৬০ গ্রাম। (আওযানে মাহমুদা পৃ. ১০৪)

উল্লেখ্য, দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব নির্ধারণে স্বর্ণ-রুপা হলো পরিমাপক। এ ক্ষেত্রে ফকীর-মিসকীনদের জন্য যেটি বেশি লাভজনক হবে, সেটিকে পরিমাপক হিসেবে গ্রহণ করাই শরীয়তের নির্দেশ। সুতরাং মুদ্রা ও পণ্যের বেলায় বর্তমানে রুপার নিসাবই পরিমাপক হিসেবে গণ্য হবে।

অতএব, যার নিকট ৫২.৫ তোলা সমমূল্যের দেশি-বিদেশি মুদ্রা বা ব্যবসায়িক পণ্য মজুদ থাকবে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

সাত. সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা, অর্থাৎ সম্পদে অন্যের কোনো হক/ অধিকার না থাকা এবং তাতে মালিকের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হওয়া। (আল মা'আইর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

আট. চন্দ্র মাসে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

উল্লেখ্য, চন্দ্র মাস হিসাবে যাকাত আদায় করলে যাকাতের পরিমাণ হবে ২.৫%, সৌরবর্ষ হিসাবে দিলে যাকাত দিতে হবে ২.৫৮%।

শস্য, ফলমূল ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং উৎপাদন ও উত্তোলন শর্ত। (আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৪)

বি. দ্র. নিসাব পরিমাণ মাল বছরের শুরু এবং শেষে বিদ্যমান থাকা শর্ত। মধ্যবর্তী সময়ে সম্পদের পরিমাণ নিসাব থেকে কমে গেলেও বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে' ২/৫১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫৫)

নয়. ঋণমুক্ত হওয়া

উল্লেখ্য, ব্যাংক থেকে উত্তোলিত ব্যবসায়িক ঋণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে ঋণ গ্রহণ করে তা কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যদি ব্যয়ের খাত এমন কোনো পণ্য হয়, যা যাকাতের আওতায় পড়ে তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে। আর যদি ব্যয়ের খাত যাকাতের আওতায় না পড়ে (যেমন–কোম্পানির ইমারত, মেশিন, পরিবহন ইত্যাদি) তাহলে এই ঋণ মূল নিসাব থেকে বিয়োগ হবে না। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত ওয়া তিজারত, পৃ. ৯৪)

দশ. হাজতে আসলিয়্যাহ থেকে অতিরিক্ত হওয়া। হাজতে আসলিয়্যাহ বলতে এমন প্রয়োজনকে বোঝানো হয়, যা মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন–আহারীয় খরচাপাতি, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬২)

এগারো. সম্পদবর্ধিষ্ণু হওয়া। অর্থাৎ ব্যবসার মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব হওয়া। আর গবাদি পশু স্ববর্ধিত বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৩, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫১)

যাকাত আদায় সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

এক.

নিয়্যাত করা

নিয়্যাত করার সময়

ক. উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদানকালে।

খ. নিয়্যাতবিহীন প্রদান করলে উপযুক্তের হাতে মাল থাকাবস্থায়।

গ. নিজের উকিলের হাতে সোপর্দ করার সময়।

ঘ. মূল নিসাব হতে যাকাতের পরিমাণ পৃথক করার সময়। (আদ্দুররুল মুখতার ২/২৬৮)

দুই.

উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৯)

ব্যবসায়িক পণ্যের সংজ্ঞা

ব্যবসায়িক পণ্য বলতে স্থাবর-অস্থাবর ওই সব পণ্যকে বোঝানো হয়, যার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা উদ্দেশ্য। পণ্যটি অবিকল বিক্রি করা হোক অথবা শিল্পায়নের পর। পণ্যের মালিকানা বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ হোক অথবা বিনিময় ছাড়া। (আল মাআঈর নং ৩৫)

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

ক. ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য রুপার নিসাবের সমমানের হতে হবে।

খ. পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

গ. পণ্য ক্রয় বা মালিকানা অর্জনের সময় ব্যবসার নিয়্যাত করা। ক্রয়ের সময় নিয়্যাত না করলে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সময় নিয়্যাত করা।

ঘ. পণ্য ব্যবসার নিয়্যাতের উপযোগী হওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ২/২১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৭১০)

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

পণ্য যে স্থানে মজুদ থাকবে সে স্থানের মার্কেট রেটে পণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে পাইকারি সেলাররা পাইকারি রেট, খুচরা বিক্রেতারা খুচরা দর, আর যেসব ব্যবসায়ী পাইকারি ও খুচরা উভয়ভাবে পণ্য সেল করে থাকে তারা যে দিকটির প্রধান্য থাকবে, সেটির ভিত্তিতে পণ্যের মূল নির্ধারণ করবে। (আল মাআঈর, পৃ. ৪৭৭)

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত টাকা/পণ্য

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত টাকা দ্বারা প্রদান করাটাই মূল বিধান। তবে যাকাতের মুস্তাহিকদের স্বার্থ রক্ষা হলে সরাসরি পণ্য দ্বারাও যাকাত আদায় করা যাবে। (আল মাআঈর, পৃ. ৪৭৭)

পণ্যে একাধিক কারণ পাওয়া গেলে

কোনো পণ্যে ব্যবসার নিয়্যাতের পাশাপাশি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্য কোনো কারণ পাওয়া গেলে, যেমন পণ্যটি গবাদি পশু বা কৃষিপণ্য, তাহলে এ ক্ষেত্রে এসব পণ্যের যাকাত ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবেই দিতে হবে। পশু বা কৃষিপণ্য হিসেবে নয়। (আল মাআঈর নং ৩৫)

যাকাতের আওতাভুক্ত পণ্যসামগ্রী

১. সব ধরনের কাঁচামাল (বাজারদরে)।

২. যেসব পণ্য কারিগরি পরিবর্তনসহ বা ছাড়া বিক্রির জন্য রাখা হয়। (বাজারদরে)

৩. উৎপাদিত পণ্য।

৪. প্রক্রিয়াধীন পণ্য, এ ক্ষেত্রে যেদিন যাকাত ওয়াজিব হবে ওই দিনের বাজারদর ধর্তব্য হবে। কোনো কারণে বাজারদর জানা সম্ভব না হলে খরচাসহ ক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে।

৫. গুদামে মজুদ পণ্য, বাজারদর বিবেচিত হবে।

৬. রাস্তায় আনার পথে যেসব পণ্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পণ্য যে স্থানে বা যে স্থানের কাছাকাছি থাকবে, সেখানের বাজারদর ধর্তব্য হবে।

৭. যেসব পণ্য ক্রয় প্রতিনিধির কাছে ওকালতির ভিত্তিতে রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও স্থানের বিবেচনায় দর নির্ণয় করে যাকাত দিতে হবে।

৮. ট্রেড মার্ক। বর্তমানে ট্রেড মার্কও একটি মূল্যমানসম্বলিত পণ্য হিসেবে বিবেচিত। তাই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেড মার্ক নিলে এরও যাকাত আদায় করতে হবে।

৯. برامج الحاسوب সফটওয়্যার। বর্তমান সময়ে এটিও একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত সফটওয়্যারের যাকাত আদায় করতে হবে।

১০. প্যাকেজিং, কার্টনজাতকরণের উপকরণ। যদি তা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য হয় এবং এর প্রভাব পণ্যের মূল্যের ওপর পড়ে তখন এসব উপকরণও যাকাতের আওতায় চলে আসবে।

১১. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা জমি, ফ্ল্যাট, গাড়ি ইত্যাদি।

১২. ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসব জমি, ফ্ল্যাট, পরিবহন ইত্যাদি ক্রয় করা হয় সেগুলোর যাকাত প্রদান করতে হবে না। তবে ভাড়া বাবদ যে অর্থ অর্জিত হবে, তা যাকাতের উপযোগী অন্য আসবাবের সাথে যোগ হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৮)

১৩. শেয়ার, শেয়ার ক্রয় Dividend-এর জন্য হলে দেখতে হবে ক্রয়কৃত শেয়ার-কোম্পানির কী পরিমাণ যাকাত উপযোগী ও অনুপযোগী সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। যার পক্ষে এটা জানা সম্ভব সে শুধুমাত্র যাকাতের উপযোগী সম্পদ অনুপাতে যাকাত আদায় করবে। যার জন্য এটা জানা অসম্ভব সে সতর্কতামূলক বাজারদরে শেয়ারের যাকাত আদায় করবে।

আর শেয়ার দ্বারা Capital gain উদ্দেশ্য হলে এটি ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর পূর্ণ মূল্যের যাকাত প্রদান করতে হবে। (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত, পৃ. ৯৩-৯৪ আল মা'আঈর নং ৩৫, পৃ. ৪৭৫)

১৪. ব্যাংক হিসাব ও লকারে যেসব অর্থ ও যাকাত উপযোগী সম্পদ জমা থাকবে সেগুলোর যাকাতও প্রদান করতে হবে। সুদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমাকৃত অর্থের যাকাত দিতে হবে। এতে সুদ যোগ হবে না। তবে সমুদয় সুদ সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের সাথে মুনাফাও যোগ হবে। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৫. বন্ড, অভিহিত মূল্যের সাথে খরচাপাতিও যোগ হবে। তবে অর্জিত মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় এতে

যাকাত আসবে না। সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (আল মা'আঈর ৩৫)

১৬. সব ধরনের বিনিয়োগ সুকুক, যতটুকু সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে সে অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। (আল মা'আঈর ৩৫, পৃ. ৪৭৬)

১৭. স্বর্ণ-রুপা, আকার-আকৃতি যা-ই হোক না কেন।

১৮. Retention amount (মা'আঈর পৃ. ৪৭৬)

১৯. বায়নাপত্রে অগ্রিম যে অর্থের লেনদেন হয় এর যাকাত বিক্রেতাকে দিতে হবে। (মা'আঈর ৪৭৬)

২০. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা পশু।

২১. সুকুকে মুকারাযা

২২. خيـــار (option) কালীন পণ্যের যাকাত মালিকের ওপর ওয়াজিব। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৭)

২৩. বেচাকেনা সলম পদ্ধতিতে হলে মূল্যের যাকাত বিক্রেতা প্রদান করবে। ক্রেতার হস্তগত হওয়ার আগে পণ্যের বিধান ঋণের যাকাতের মতো। আর হস্তগত হওয়ার পর এর বিধান ব্যবসায়িক পণ্যের মতো। যদি এর দ্বারা ব্যবসা করাই উদ্দেশ্য হয়। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৪. ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান সলমের মতোই হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৯)

২৫. ঋণের যাকাত

ক. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়। অথবা অক্ষম কিন্তু ঋণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। কিংবা অস্বীকার করে কিন্তু পাওনাদারের কাছে শরয়ী প্রমাণ বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় পাওনাদার ওই অর্থ ফেরত পাওয়ার পর হিসাব করে বিগত দিনসমূহের যাকাত আদায় করবে।

খ. আর যদি ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে কিংবা অস্বীকার করে এবং পাওনাদারদের নিকট কোনো শরয়ী প্রমাণও না থাকে। এমতাবস্থায় যদি কোনো সময় এই ঋণ পাওনাদারের হস্তগত হয় তাহলে হস্তগত হওয়ার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে এর যাকাত প্রদান করতে হবে। বিগত দিনের যাকাত দিতে হবে না।

(বাদায়েউস সানায়ে ২/১০, আদ্দুররুল মুখতার ও শামী ২/২৬৬-২৬৭ আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৭২,২/৬৭৭)

২৬. সমুদ্র থেকে যেসব জিনিস আহরণ করা হয়। যেমন মাছ, মূল্যবান পাথর, হিরা, মুক্তা, ঝিনুক ইত্যাদি। ব্যবসার উদ্দেশ্যে এগুলো আহরণ করা হলে ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় এগুলোরও যাকাত প্রদান করতে হবে।

২৭। ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেসব গবাদি পশু লালন-পালন বা ক্রয় করা হয় ব্যবসায়িক পণ্যের মতো বাজারদরে সেগুলোরও যাকাত আদায় করতে হবে।

২৮। গবাদি পশু ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হলে এগুলোর ওপরও যাকাত ওয়াজিব হবে এবং ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় যাকাত দিতে হবে।

২৯। ডেইরি ফার্মের গাভি এবং ডিমের ফার্মের মুরগি-হাঁস ও কোয়েলের যাকাত দিতে হবে না। তবে দুধ ও ডিম বিক্রি করে যা আয় হবে তার যাকাত দিতে হবে। যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্যান্য শর্ত পাওয়া যায়।

৩০। বয়লার ফার্মের মোরগ এবং গরু, ছাগল মোটাতাজাকরণের ফার্মের গরু-ছাগল ব্যবসায়িক পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়িক পণ্যের মতো বাজারদরে এসব প্রাণীর যাকাত দিতে হবে। (আল মা'আঈর নং ৩৫)

যাকাতের পরিমাণ

১. স্বর্ণে	২.৫%
২. রুপায়	২.৫%
৩. দেশি-বিদেশি মুদ্রা	২.৫%
৪. ব্যবসায়িক পণ্য	২.৫%

৫. ক্ষেতে উৎপাদিত শস্য ও ফলফলাদিতে ৫% বা ৭.৫% অথবা ১০%

৬। খনিজ সম্পদ ২.৫%

(আল মা'আঈর নং ৩৫)

হারাম মাল

ক. জাতিগত হারাম হলে, যেহেতু এটি শরীয়ত নিষিদ্ধ তাই এতে যাকাতের হুকুম জারি হবে না। যেমন : শূকর, মদ ইত্যাদি।

খ. বিশেষ কোনো কারণে হারাম। যেমন : স্বর্ণ-রুপার তৈরি মূর্তি। প্রকৃত মু'মীনের জন্য এর আকৃতি মিটিয়ে দিয়ে স্বর্ণ-রুপার যাকাত প্রদান করা জরুরি।

গ. অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ। যেমন : চুরি-ছিনতাই, ডাকাতি-হাইজ্যাক, সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি, গান-বাদ্য করে উপার্জিত সম্পদ ও শরীয়ত কর্তৃক অসমর্থিত পন্থায় উপার্জিত অন্য কোনো সম্পদ যেহেতু এই সম্পদগুলোর মালিক সে নয়, বিধায় তাকে এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। বরং এ সম্পদ তার প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই শরীয়তের বিধান। বিহিত কারণে সম্ভব না হলে পুরো সম্পদ সদকা করে দিতে হবে। (শামী ২/২৯০-২৯১, আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৫৪)

সন্দেহজনক মাল

কোনো মালের ব্যাপারে হালাল নাকি হারাম–এ মর্মে সন্দেহ হলে কোনো বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের সাথে আলোচনা করে সংশয়ের নিরসনের চেষ্টা করতে হবে।

যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করা

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে যাকাতের রুকন হলো উপযুক্ত কাউকে পরিপূর্ণভাবে মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং যাকাতের অর্থ উপযুক্ত খাতে না দিয়ে লাভজনক কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা বিলিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। (সূরা তাওবা ৬০)

যাকাতের অর্থে ট্যাক্স প্রদান

যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে পার্থক্য আসমান-জমিনের। যাকাত নিখুঁত একটি ইবাদত। আর ট্যাক্স রাষ্ট্রের তরফ থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি জিনিস। অতএব, দুটিকে এক মনে করে যাকাতের অর্থ দ্বারা ট্যাক্স ও রাজস্ব আদায় করলে যাকাত আদায় হবে না। (শামী : ২/২৭০)

কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে?

যেদিন আদায় করা হবে সেই দিনের পণ্য মূল্যের যাকাত আদায় করতে হবে। (শামী ২/২৮৬)

পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে মালিকানা কখন লাভ হবে?

কন্ট্রাক্ট F.O.B-এর ভিত্তিতে হলে মাল লোড হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা স্বত্ব লাভ হবে। আর C.I.F-এর ভিত্তিতে হলে মাল বন্দরে পৌঁছার সাথে সাথে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ৮/৪৬৬)

যেসব জিনিসের যাকাত নেই

১. নিজেদের ব্যবহৃত ইমারত ভবন।
২. অফিশিয়াল যাবতীয় আসবাব।
৩. গুদামঘর।
৪. কাজের স্বার্থে যেসব জিনিস ক্রয় করা হয় । যেমন : এসি, ফ্যান, এয়ারকুলার, কম্পিউটার ইত্যাদি।
৫. কারিগরি স্বার্থে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি।
৬. খুচরা যন্ত্রাংশ।
৭. কোম্পানির স্বার্থে ক্রয়কৃত মালবাহী বা মানুষবাহী পরিবহন।
৮. ভাড়া দেওয়ার জন্য ক্রয়কৃত প্লট, ফ্ল্যাট, গাড়ি বা অন্য কিছু।
৯. কোম্পানির ভবন বা দফতর নির্মাণের জন্য ক্রয়কৃত জমি।
১০. কার্টন, প্যাকেজিংজাতীয় আসবাব, যা শুধুমাত্র পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয় করা হয়। বিক্রি বা পণ্যের সাথে ক্রেতাকে দেওয়ার জন্য নয়।
১১. পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে যেসব জিনিস এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় যে এর কোনো অস্তিত্ব বা নাম-গন্ধও অবশিষ্ট থাকে না। যেমন : জ্বালানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত সাবান ইত্যাদি।

বি. দ্র. এ-জাতীয় পণ্যের যতটুকু বছরের শেষ দিন মজুদ থাকবে তা অবশ্যই যাকাতের আওতায় পড়বে। শুধুমাত্র যতটুকু ব্যবহার হবে, ততটুকুই বাদ যাবে। (মা'আঈর ৪৭৮)

১২. পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত কুকুর। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ২/৬৫১)
১৩. Charitable fund ও Trust
১৪. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না। (মা'আঈর ৪৭৩)
১৫. কোনো কন্ট্রাক্ট বাবদ যে অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়। (মা'আঈর ৪৭৯)
১৬. ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য।(পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশুর যাকাত প্রদান করতে হবে তবে ওই পশুসমূহের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যাকাত দিতে হবে না।) (হিন্দিয়া ১/১৮০, আল মৌসু'আ ২৩/২৭৪)

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র বা 'মাসারিফ'

পবিত্র কোরআনে কারীমে আট ধরনের লোকদের যাকাত প্রদানের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন : ইরশাদ হচ্ছে– প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও মিসকীনদের হক এবং সেই সকল কর্মচারীর, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের। তা ছাড়া দাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধ এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফীরদের সাহায্যেও তা ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হিকমতেরও মালিক। (সূরা তাওবা ৬০)

কোরআনে উল্লিখিত আট ধরনের লোকদের মধ্যে এক প্রকার হলো অমুসলিমদের মনোরঞ্জনের জন্য যাকাত দেওয়া। হযরত উমর (রা.)-এর জামানায় ইসলামের ব্যাপকতা লাভ ও মুসলমানদের ব্যাপক শক্তি অর্জিত হওয়ার পর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায়

তালীফে কলবের জন্য যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেন। ওই সময়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম হযরত উমরের (রা.) এ সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন। অবশিষ্ট থাকে সাত ধরনের লোক, তারা কারা? এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ফকীর, ওই ব্যক্তি যার মালিকানায় যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, যদিও ওই ব্যক্তি কর্মক্ষম ও কর্মরতও হয়।

২. মিসকীন, ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যার মালিকানায় কোনো ধরনের সম্পদ না থাকে।

উল্লেখ্য যে, নিজের মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি ফকীর-মিসকীন হলেও তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে নিজের ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, খালা, মামা, সৎমা, শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাতাকে ফকীর বা মিসকীন হওয়ার শর্তে যাকাত দেওয়া যাবে।

৩. আ'মেল তথা যাকাতের মাল সংগ্রহকারী; ইসলামী হুকুমতের বায়তুল মাল কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদের সংগৃহীত যাকাতের সম্পদ থেকে বিনিময় প্রদান করা। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকাত সংগ্রহে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কমিশন হারে যাকাত থেকে বিনিময় প্রদান কোনোভাবেই শরীয়তসম্মত নয়।

৪. গোলাম অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করে আজাদ হওয়ার জন্য গোলামকে যাকাত প্রদান করা। বর্তমানে এই খাতটিও বিদ্যমান নেই।

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কোনো ব্যক্তি এই পরিমাণ ঋণী হলে যে ঋণ আদায় করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে না। এমন ব্যক্তিকেও যাকাত দেওয়া বৈধ।

৬. আল্লাহর রাস্তায় থাকা ব্যক্তি, যে সকল মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে এবং তাদের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ না থাকলে।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, ইমামগণের নিকট আল্লাহর রাস্তা বলতে নির্ধারিত খাতকে বোঝানো হয়েছে। তাই কোনো ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা বা অন্য কোনোভাবে ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর রাস্তায় আছি মনে করে যাকাত নেওয়ার উপযুক্ত দাবি করার কোনো অবকাশ নেই।

৭. মুসাফীর, কোনো ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোথাও সফরে এসে সম্পদ শূন্য হয়ে পড়লে, তাকে বাড়িতে পৌঁছতে পারে পরিমাণ যাকাত প্রদান করা। উল্লিখিত সব খাতে অথবা যেকোনো একটি খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এই খাতগুলো ছাড়া অন্য কোনো খাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। চাই সেটি যতই ভালো কাজ হোক না কেন। তাই মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ এবং কোনো প্রকল্প যেখানে কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়–এমন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। বরং তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

সংশয় ও নিরসন

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'মাসারিফে যাকাত' বলা হয়। এটিও স্পষ্ট হয়েছে যে যাকাত যাকে প্রদান করা হবে তাকে পরিপূর্ণ মালিক বানিয়েই দিতে হবে।

এ পর্যায়ে একটি সংশয়ের নিরসন প্রয়োজন। সেটি হলো বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। এর হুকুম কী হবে?

মূলত যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাকাত সংগ্রহ করে থাকে তার মধ্যে কওমী মাদ্রাসাসমূহ অন্যতম। এ সকল মাদ্রাসায় যাকাত নেওয়ার উপযোগী বহু ছাত্র পড়ালেখা করতে আসে। তাদের জন্যই মূলত এই যাকাত সংগ্রহ করা হয়। এবং তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় ওই সকল ছাত্রকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়।

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। তাই যে সকল মাদ্রাসা যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে যাকাতের অর্থ পৌঁছে দেয় সে সকল মাদ্রাসায় যাকাত দেওয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

রয়ে গেছে অন্যান্য সংগঠন সংস্থা। সম্প্রতি বিভিন্ন সংগঠন, এমনকি টিভি চ্যানেলও ইসলামের খেদমতের নামে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের কাছে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যাকাতের কোনো ক্ষেত্র থাকা স্পষ্ট নয়। তাই ওই সকল সংগঠন ও প্রকল্পে যাকাত প্রদানে সতর্ক থাকা জরুরি।

সাদকাতুল ফিতর, ঈদুল ফিতর
ফাজায়েল ও মাসায়েল

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

সাদকাতুল ফিতরের বিধান

হাদীসে এসেছে–

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোজাদারের জন্য সাদকাতুল ফিতর আদায় অপরিহার্য করে দিয়েছেন, যা রোজাদারের অনর্থক, অশ্লীল কথা ও কাজ পরিশুদ্ধকারী ও অভাবী মানুষের জন্য আহারের ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে এটা আদায় করবে তা সাদকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ঈদের নামাযের পর আদায় করবে তা অপরাপর (নফল) সাদকা হিসেবে গৃহীত হবে।' (আবু দাউদ ১৩৭১)

☆ সাদকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব?

ওই ব্যক্তির ওপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, যে ঈদের দিন ভোরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হিসেবে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হবে। যাঁর ওপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন, তেমনি নিজের পোষ্যদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন।

☆ সাদকাতুল ফিতরের পরিমাণ :

গম ও আটার হিসাবে অর্ধ সা' (১.৫ কেজি ৭৪ গ্রাম ৬৪০ মি. গ্রা.) অথবা তার সমমূল্য। খেজুর, কিশমিশ, যবের হিসাবে এক সা' অথবা তার সমমূল্য।

☆ কখন আদায় করবেন সাদকাতুল ফিতর?

সাদকাতুল ফিতর আদায় করার দুটি সময় আছে। একটি হলো উত্তম সময়, অন্যটি বৈধ সময়। আদায় করার উত্তম সময় হলো ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে।

যেমন হাদীসে এসেছে–

'ইবনে উমর থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।' (মুসলিম শরীফ ১৬৩৬)

☆ সাদকাতুল ফিতর কাকে দেবেন?

যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত–এমন অভাবী লোকদের সাদকাতুল ফিতর প্রদান করা যাবে। একজন দরিদ্র মানুষকে একাধিক ফিতরা দেওয়া যেমন জায়েয আছে, তেমনি একটি ফিতরা বণ্টন করে একাধিক মানুষকে দেওয়াও জায়েয।

ঈদের তাৎপর্য

হাদীস শরীফে আছে–

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনাতে আগমন করলেন তখন মদীনাবাসীদের দুটি দিবস ছিল, যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এ দুই দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদীনাবাসীগণ উত্তর দিলেন : আমরা মূর্খতার যুগে এ দুই দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটি দিন দিয়েছেন। তা হলো ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।' (আবু দাউদ ৯৫৯)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্মানিত করে তাদের এ দুটি ঈদ দান করেছেন। আর এ দুটি দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে, তার সবকটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সেরা দিন।

ইসলামের এ দুটি উৎসবের দিন শুধু আনন্দ-ফুর্তির দিন নয়। বরং এ দিন দুটিকে খুশি-আনন্দের সাথে সাথে জগৎসমূহের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা করবে সুসজ্জিত। যিনি জীবন দান করেছেন, দান করেছেন সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, যাঁর জন্য জীবন ও মরণ তাঁকে এ আনন্দের দিনে ভুলে যাওয়া কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত-বন্দেগী, তাঁর প্রতি শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সুসজ্জিত করেছে।

ঈদের দিনের করণীয়

☆ গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা। ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মুস্তাহাব। কেননা এদিনে সকল মানুষ নামায আদায়ের জন্য মিলিত হয়। যে কারণে জুমু'আর দিন গোসল করা মুস্তাহাব সে কারণেই ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে–

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.) বলেন : ঈদুল ফিতরের সুন্নাত তিনটি : ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহের দিকে রওনা হওয়ার পূর্বে মিষ্টিজাতীয় কিছু খাওয়া, গোসল করা। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

এমনিভাবে সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

☆ ঈদের দিনে খাবার গ্রহণ

সুন্নাত হলো ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে মিষ্টিজাতীয় খাবার গ্রহণ করা। আর ঈদুল আজহার দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কিছু না খেয়ে নামায আদায়ের পর কোরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে–

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আজহার দিনে ঈদের নামাযের পূর্বে খেতেন না। নামায থেকে ফিরে এসে কোরবানীর গোশত খেতেন। (মুসনাদে আহমদ ১৪২২)

☆ হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া

ঈদগাহে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। যাতে ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থানে বসা যায় ও ভালো কাজ অতি তাড়াতাড়ি করার সাওয়াব অর্জন করা যায়, সাথে সাথে নামাযের অপেক্ষায় থাকার সাওয়াব পাওয়া যায়। ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'সুন্নাত হলো ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া।' (তিরমিযী ১৮৭)

আর একটি সুন্নাত হলো : যে পথে ঈদগাহে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসা। যেমন হাদীসে এসেছে,

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে যে পথে যেতেন, ফিরতেন ভিন্ন পথে।' (বোখারী শরীফ ১৪৫)

☆ ঈদের তাকবীর আদায়

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। যখন নামায শেষ হয়ে যেত তখন আর তাকবীর পাঠ করতেন না। আর কোনো কোনো বর্ণনায় ঈদুল আজহার ব্যাপারে একই কথা পাওয়া যায়। আরো প্রমাণিত আছে যে ইবনে উমর (রা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদগাহে এসে ইমামের আগমন পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।

ঈদের নামায

☆ ঈদের নামাযের হুকুম

'ঈদের নামায প্রত্যেক মুসলমান বালেগ পুরুষের ওপর ওয়াজিব।

☆ ঈদের নামাযের পূর্বে কোনো নামায নেই

হাদীসে এসেছে–

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে বের হয়ে দুই রাক'আত ঈদের নামায আদায় করেছেন। এর পূর্বে ও পরে অন্য কোনো নামায আদায় করেননি।' (বোখারী শরীফ ৯৩৫)

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতি

ঈদের নামায হলো দুই রাক'আত। হাদীসে এসেছে–

উমর (রা.) বলেন : 'জুমু'আর নামায দুই রাক'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাক'আত, ঈদুল আজহার নামায দুই রাক'আত ও সফর অবস্থায় নামায হলো দুই রাক'আত।' (নাসাঈ ১৪০৩)

ঈদের নামায শুরু হবে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত উঠাবে। প্রথম রাক'আতে তাকবীরসমূহ আদায় করার পর সূরা ফাতেহা পড়বে, তারপর যেকোনো সূরা পড়বে। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাত শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং রুকুতে যাবে। নামায শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব খুতবা দেবেন। মনে রাখা দরকার, ঈদের খুতবা হবে নামায আদায়ের পর। নামায আদায়ের পূর্বে কোনো খুতবা নেই। হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশে রওনা হতেন। ঈদগাহে প্রথমে নামায শুরু করতেন। নামায শেষে মানুষের দিকে ফিরে খুতবা দিতেন, এ খুতবাতে তিনি তাদের ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন, বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। আর এ অবস্থায় মুসল্লিগণ তাদের কাতারে বসে থাকত।' (বোখারী শরীফ ৯৫৬)

☆ ঈদে শুভেচ্ছা বিনিময় করা

একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানানো, মানুষের সুন্দর চরিত্রের একটি দিক। এতে খারাপ কিছু নেই। বরং এর মাধ্যমে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা ও দু'আ করা হয়। পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। ঈদ উপলক্ষে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরীয়ত অনুমোদিত একটি বিষয়। বিভিন্ন বাক্য দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। যেমন :

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন : 'জোবায়ের ইবনে নুফাইর থেকে বর্ণিত যে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে বলতেন :

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

'আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনার ভালো কাজগুলো কবুল করুন।' (আল মু'জামুল কাবির লিত তাবারানী : ১৭৫৮৯)

☆ আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া ও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া :

সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন মাতা-পিতা। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সকল প্রকার মনোমালিন্য দূর করার জন্য ঈদ হলো একটা বিরাট সুযোগ। কেননা হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ সম্পর্ক এমন একটা বিষয়, যা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। হাদীসে এসেছে–

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে তাকে ব্যতীত সেদিন সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়; কিন্তু ওই দুই ভাইকে ক্ষমা করা হয় না, যাদের মাঝে হিংসা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তখন (ফেরেশতাদের) বলা হয়, এ দুজনকে অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়! এ দুজনকে অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়! এ দুজনকে অবকাশ দাও, যেন তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিটিয়ে মিলেমিশে যায়!' (মুসলিম শরীফ ২৫৬৫)

এ সকল হাদীসে ভাই বলতে শুধু আপন ভাইকে বোঝানো হয়নি বরং সকল মুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে। হোক সে ভাই অথবা প্রতিবেশী কিংবা চাচা বা বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, সহপাঠী বা অন্য কোনো আত্মীয়। তাই যার সাথে ইতিপূর্বে ভালো সম্পর্ক ছিল, এমন কোনো মুসলমানের সাথে সম্পর্ক খারাপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায়। যদি কেউ এমন অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তার এ অন্যায় থেকে ফিরে আসার এক মহা সুযোগ হলো ঈদ।

ঈদে যা বর্জন করা উচিত :

ঈদ হলো মুসলমানদের শান-শওকত প্রদর্শন, তাদের আত্মার পরিশুদ্ধতা, তাদের ঐক্য-সংহতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। কিন্তু দুঃখজনক হলো বহু মুসলিম এ দিনটাকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে জানে না। তারা এই দিনে বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজকর্মে মশগুল হয়ে পড়ে। এ ধরনের কিছু কাজকর্মের আলোচনা করা হলো :

☆ কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ বা আচরণ করা

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।' (আবু দাউদ ৪০৩১)

☆ পুরুষ হয়ে নারীর-নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ

পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের নারীর বেশ ধারণ ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদীসে এসেছে–

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই সকল মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ওই সকল পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা মহিলার বেশ ধারণ করে। (আবু দাউদ ৪০৯৭)

☆ বেগানা মহিলা পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

মনে রাখতে হবে যে মহিলাদের জন্য খোলামেলা ও অশালীন পোশাকে রাস্তাঘাটে বের হওয়া ইসলামী শরীয়তে

নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'আর তোমরা নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতার যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' (আহযাব ৩৩)

হাদীসে এসেছে–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'দুই ধরনের জাহান্নামী আছে, যাদের আমি এখনো দেখতে পাইনি। (আমার যুগের পরে দেখা যাবে) একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে। আর একদল এমন মেয়েলোক, যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ হবে। অন্যদের আকৃষ্ট করবে ও তারা অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।' (মুসলিম : ২১২৮)

☆ বেগানা মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

অনেককে দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই গোনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করে। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়ত অনুমোদিত নয়, তাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়। হাদীসে এসেছে–

সাহাবী উকবাহ ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'তোমরা বেগানা মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে।' আনসারী সাহাবীদের মধ্য থেকে এক লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাশুর প্রমুখ আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি উত্তরে বললেন : 'এরা তো মৃত্যুর সমতুল্য।' (মুসলিম শরীফ ২১৭২)

এ হাদীসে আরবী حمو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন সকল আত্মীয়, যারা স্বামীর সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতম। যেমন স্বামীর ভাই, তার মামা, খালু প্রমুখ। তাদেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করার কারণ হলো, এ সকল আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমেই বেপর্দাজনিত কেলেঙ্কারি বেশি ঘটে থাকে।

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156
ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent
হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।
Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

কাদিয়ানী ধর্মমত-৫

মুফতী শরীফুল আজম

কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর লেখা বই-পুস্তকে ইসলামের অকাট্য আকীদা-বিশ্বাসবিরোধী এমন সব মতাদর্শ বিদ্যমান, যা মেনে নিলে ঈমান থাকে না। যেমন নিজেকে খোদা বা খোদার পুত্র হওয়ার দাবি, নবী হওয়ার দাবি, ওহী প্রাপ্তির দাবি, খতমে নবুওয়াত অস্বীকার, নবী-রাসূলদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অশালীন বক্তব্য, তার অনুসারী ছাড়া সকল মুসলমানকে কাফের ঘোষণা ইত্যাদি। যার প্রেক্ষিতে কাদিয়ানী ফেরকাকে বিভিন্ন মুসলিম দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। বক্ষ্যমাণ ধারাবাহিক লেখায় কাদিয়ানী ধর্মমতের পটভূমি, সূচনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ভয়াবহতা এবং তাদের কুফরী আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে পাঠকের সামনে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আফগানিস্তানে অপতৎপরতা

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার আহবান জানিয়ে জাতিসংঘের প্রতি আবেদন :

"আহমদিয়া জামাতের পক্ষ থেকে মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ হযরত মসীহর দ্বিতীয় খলীফা জাতিসংঘের প্রতি আকুল আবেদন করেন যে, সম্প্রতি পনেরো জন পুলিশ কনস্টেবল ও সুপারদের মাধ্যমে কাবুল সরকার দুজন কাদিয়ানীকে ধর্মীয় বিরোধের কারণে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করেছে। অতএব, কাবুল রাজদের ওপর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হোক। কেননা এ সরকার সকল ধর্মের প্রতি সমান সুবিচার করে রাজ্য পরিচালনা করার যোগ্যতা রাখে না। (আল-ফজল, কাদিয়ান, খ. ১২, সংখ্যা-৯৫, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫)

কাবুল সরকারের বিরোধিতা

মিঞা মাহমুদ আহমদ জুমু'আর খুতবায় বলেছেন,

"বর্তমানে (বাদশাহ্ আমানুল্লাহের শাসনামলে) কাবুল যে যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধে শুরু করেছে এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। আহমদীদের ওপর সরকারের খেদমত করা ফরয। কেননা গভর্নমেন্টের অনুসরণ করাই আমাদের দায়িত্ব। তবে আফগানিস্তানের যুদ্ধ আমাদের জন্য অন্য এক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কেননা কাবুল ওই ভূখণ্ড যেখানে আমাদের অতি মূল্যবান কিছু অস্তিত্ব ধ্বংস হয়েছে। মূল্যবান প্রাণ সংহার করা হয়েছে... এবং বিনা কারণে, অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। কাবুল সেই জায়গা, যেখানে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার নিষিদ্ধ এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দুয়ার রুদ্ধ। অতএব, সত্যের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে এসব জালেমকে উৎখাত করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করা আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্তব্য বা ফরয। সুতরাং চেষ্টা করো যাতে তোমাদের মাধ্যমে সেসব শাখা সৃষ্টি হয়, যেসবের সংবাদ মসীহ মওউদ দিয়েছেন।"(আল ফজল, খ. ৬, ২৭ মে ১৯১৯)

কাবুল যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য

যখন কাবুলের সাথে যুদ্ধ হয়েছে তখনো আমাদের জামাত নিজের সামর্থ্য নিয়ে সাহায্য করেছে; নানা সহায়তা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। একটি ডাবল কোম্পানি পেশ করেছে। যদিও যুদ্ধের কারণে তাদের ফৌজে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। এতে সহস্রাধিক যোদ্ধা নাম লিখিয়েছিল। আমাদের মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতার কনিষ্ঠ পুত্র এবং বর্তমান ইমামের ছোট ভাই স্বয়ং এতে নিজেদের সেবা পেশ করেছিলেন। ছয় মাসব্যাপী তাঁরা ট্রান্সপোর্ট কোরে অনারারিভাবে কাজ করেন।

আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী ও জায়নবাদী তৎপরতা

আফ্রিকা পৃথিবীর সে অভাগা মহাদেশ, যেখান থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সবশেষে তার পাঞ্জা গুটিয়ে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত এর বেশ কিছু অংশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয়ে বন্দি রয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার কতিপয় এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রথম ঘাঁটি তৈরির ক্ষেত্রে কাদিয়ানীদের ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট। এরাই গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে ইংরেজদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। দ্য ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম সংস্করণের ১৯৭০ ইং তে উল্লিখিত হয়েছে।

"The Ahmadiyya first appeared on the west African cost during the first World War, when several young men in Lagos and Free Town joined by Mail. In 1921 the first Indian Missionary arrived. Too unorthodox to gain a footing in the Muslim interior, the Ahmadiyya remain confined principally to Southern Nigeria, Southern Gola Coast

Sierraleone. It strengthened the ranks of those Muslim actively loyal to the British, and it contributed to the modernization of Islamic organization in the area. (The Cambridge History of Islam, Vol. II, edited by Halt, Lambton, and Lemis, Cambridge University Press, 1970. P-400)

অনুবাদ : "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আহমদী সম্প্রদায়ের লোকেরা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকায় পৌঁছে; যেখানে লাউস ও ফ্রি টাউনের কতিপয় যুবক তাদের সাথে মিলিত হয়। ১৯২১ সালে প্রথম ভারতীয় মিশন সেখানে পৌঁছে যদিও তারা কোনো আকীদা প্রচার করতে সক্ষম হয়নি, তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনবসতিগুলোতে নিজেদের কদম মজবুত করা। এসব লোক অধিকাংশই দক্ষিণ নাইজেরীয়। এরা দক্ষিণ গোল্ডকোস্ট এবং সিয়েরা লিয়নে তৎপরতা চালাত। এরা ওসব মুসলিম সৈন্যদের শক্তিশালী করেছে, যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি ছিল সীমাহীন অনুগত। এ ছাড়া এতদঞ্চলে তারা ইসলামকে নতুন নতুন চাহিদার বেড়াজালে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়।"

এ উদ্ধৃতি থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ১৯২১ পর্যন্ত কাদিয়ানী সম্প্রদায় দক্ষিণ গোল্ডকোস্ট এবং সিয়েরা লিওনেই অধিক হারে জমে রয়েছে। গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হিন্দুস্তানের মতো এখানকার মুসলমানদেরও ব্রিটিশভক্তি ও জিহাদের হুকুম রহিত করার বাণী প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদের অনুগত রাখার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিককালে "আফ্রিকা স্পিং' নামে কাদিয়ানীরা মির্জা নাসের আহমদের আফ্রিকা সফরের যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তা আফ্রিকায় কাদিয়ানীদের অপতৎপরতার সাক্ষী। এতে নিম্নলিখিত কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : One of the main points of Gholam Ahmad's has been rejection of "Holy War's" and forcible conversion." - (Africa Speaks, Page-93 Published by Majlis Nusrat Islam, Tahrik-E-Jadid, Rabwah)

অর্থাৎ, গোলাম আহমদের গুরুত্বপূর্ণ আকীদাসমূহের অন্যতম হলো পবিত্র জিহাদের অস্বীকার।

মরিশাস একটি আফ্রিকীয় দ্বীপ। ১৯৬৭ সালে এখান থেকে "দ্য মুসলিম ইন মরিশাস" নামক একটি বই (জনাব মোমতাজ উমরিয়্যত কৃত) প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী। কৃতি লেখক বইটিতে সেখানকার কাদিয়ানীদের ঘৃণিত অপতৎপরতার উল্লেখ করেছেন, যা মুসলমানদের মর্মপীড়ার কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

এ প্রসঙ্গে লেখক মুসলমানদের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত একটি মামলার উল্লেখ করেছেন। লেখকের দাবি অনুযায়ী এই "রোজহিল মসজিদ মামলাকেই মরিশাসের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মামলা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যে মামলার শুনানি ও সাক্ষী দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করতে থাকেন। এবং ১৯ নভেম্বর, ১৯২০ সালে প্রধান বিচারক সরাই হেরচিজ্যোডরে এ রায় দেন যে, "মুসলমান ভিন্ন জাতি আর কাদিয়ানী ভিন্ন জাতি।"

বইটি পড়লে এ কথাও জানা যায় যে এখানেও তাদের আগমন ব্রিটিশ সেনাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই ঘটেছিল। লেখকের ভাষায় : কাদিয়ানী ধর্মমতে বিশ্বাসী দুজন সৈন্য ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে এখানে এসেছিল। তাদের নাম দ্বীন মোহাম্মদ ও বাবু ইসমাঈল খান। এরা ১৭০০ রয়েল ইনফেন্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯১৫ পর্যন্ত এরা এদের তাবলীগি কার্মকাণ্ড (?) পরিচালনা করতে থাকে। (বিস্তারিত দ্রঃ আল-মিম্বার, লায়লপুর, খ. ৯-২২, পৃষ্ঠা ৭ ও ৮)

দুই বছর পূর্বে আফ্রিকায় তাবলীগের নামে যে দুটি স্কিম 'নুসরত জাহান রিজার্ভ ফান্ড' এবং 'এগিয়ে চলো স্কিম' নামে চালু করা হয় এর পরিকল্পনা গৃহীত হয় লন্ডনে আর এর অ্যাকাউন্টগুলো খোলার পেছনে মির্জা নাসের আহমদের ভূমিকা ছিল প্রধান। (আল ফজল, রবওয়াহ, ২৯ জুলাই, ১৯৭২ ইং)

আফ্রিকায় জায়নবাদী সেনাদল

ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা ছাড়া কাদিয়ানীরা আফ্রিকায় জায়নবাদী ইহুদিচক্র ও ইসরাইলের সপক্ষের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত সেনাদল বলে প্রমাণিত। ১৩ জুলাই ১৯৭৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত মির্জা নাসের আহমদ বিভিন্ন দেশে যে সফর করে তার উদ্দেশ্যও ছিল নিরেট রাজনৈতিক। লন্ডন মিশনে মাহমুদ হলে যে গোপন বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এসবের উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ইসরাইলি সম্প্রসারণবাদের পূর্ণতা বিধান। (মাসিক আল-হক, খ. ৯, পৃ. ২৫)

আফ্রিকায় এহেন তৎপরতার ব্যাপ্তি ও প্রভাব সম্পর্কে তখন ধারণা করা যায় যখন দেখা যায় যে আফ্রিকায় বিশ্ব ইহুদি সংস্থা (WZO) এবং এর সমস্ত এজেন্সি এমনকি ইসরাইলি "জিউস এজেন্সি" স্বয়ং তাদের ঘৃণ্য তৎপরতার ক্রীড়নকরূপে কাদিয়ানীদের ব্যবহার করছে সম্পূর্ণ

খোলাখুলিভাবে। আরবদের জন্য যা নিতান্ত উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় যেসব আফ্রিকী রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সে দেশের সরকারবিরোধী শিবিরের সাথে মিলিত হয়ে কাদিয়ানীরা সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে।

লক্ষ কোটি টাকার পুঁজি

আফ্রিকীয় রাষ্ট্রসমূহে এসব তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার পুঁজি কোত্থেকে আসে? এটি একটি দুর্বোধ্য ধাঁধা। যে ধাঁধা আরববিশ্বের স্বনামধন্য লেখক, চিন্তাবিদ মোহাম্মদ মাহমুদ সাওওয়াফকেও চিন্তায় ফেলে দিতে সক্ষম হয়। তিনি তাঁর সাম্প্রতিক বই 'ইসলামী জাগরণ প্রতিরোধে সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশা'-এর ২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

এই কাফের জামাতটি সর্বদাই পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে এসেছে। সদা-সর্বদা ইসলামের দুশমনি করাই তাদের মূল কাজ। বিশেষত আফ্রিকার মাটিতে তাদের জঘন্য তৎপরতা সর্বাপেক্ষা জোরদার। পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডা থেকে এ প্রসঙ্গে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। এর সাথে কাজ্জাব মির্জা গোলাম আহমদের একটি বইও রয়েছে। সে নিজেকে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী বলে দাবি করে থাকে। বইটির নাম 'শুভবার্তার পায়রা'। কুফর ও গোমরাহীতে পূর্ণ এই বইটি সে এলাকায় বিপুল পরিমাণে বণ্টন করা হয়েছে। মুসলমানদের একজন বড় দাঈ ও ধর্মীয় নেতা লিখিত এই পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, "এখানে কাদিয়ানীদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা আমার ও সকল মুসলমানের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। ওরা এতদঞ্চলে বেহিসাব অর্থ ছড়াচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ অর্থ-সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার মিশনারিগুলোর পক্ষ থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে। বিশ্বস্ত একটি সূত্রে আমি খবর পেয়েছি যে, হাবশার আদ্দিস আবাবায় কর্মরত একটি কাদিয়ানী মিশনের বার্ষিক বাজেট ৩৫ মিলিয়ন ডলার। আর এই মিশনটি কেবল ইসলামের শত্রুতার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

উল্লিখিত বর্ণনায় শুধু একটি কথাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আজ পর্যন্ত আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাঞ্জা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়ার এবং বিশ্ব ইহুদি চক্রের ষড়যন্ত্রে নিপতিত থাকার বহু কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো মুসলমান পরিচয়দানকারী জাতীয় গাদ্দার কাদিয়ানীদের সীমাহীন জঘন্য অপতৎপরতা।

উপমহাদেশে কাদিয়ানীদের তৎপরতা

এ পর্যায়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়, মুসলমানদের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যাপৃত সংগঠনসমূহ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করা, একটি কাদিয়ানী রাষ্ট্র কায়েম, অগত্যা উপমহাদেশ পুনরেকত্রীকরণ সম্পর্কিত জঘন্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও মারাত্মক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যতগুলো আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে উল্লিখিত বিবরণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে কাদিয়ানীরা কেবল ইংরেজদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই এগুলোর বিরোধিতা করেনি বরং এ ধরনের প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষতিসাধনের জন্য কাদিয়ানীরা ইংরেজদের সপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে, গোপন তথ্য পাচার করে, আন্দোলনগুলোর সর্বনাশ করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। জিহাদ ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে ভারত ও বহির্বিশ্বে কাদিয়ানীদের কর্মতৎপরতার বর্ণনা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। একদিকে যেমন এসব গোয়েন্দা তৎপরতা আরব এবং মুসলিম বিশ্বে চালু থেকেছে, অন্যদিকে পাক-ভারতীয় উলামায়ে কেরাম যখন ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' সাব্যস্ত করে জুমু'আর নামায ইত্যাদি বিষয়ে মত প্রকাশ করলেন তখন মির্জা সাহেব এসব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে ইংরেজ কর্মকর্তাদের নামে পত্র ছাড়লেন। যাতে তিনি ইংরেজ সরকারকে একটি পলিসি বাতলে দিয়েছিলেন, যাতে করে জুমু'আর মতো একটি পবিত্র দিবসকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করা যায়। ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণাকারী উলামায়ে কেরামকে গালাগাল করে তিনি এ পত্র বা বিজ্ঞাপন ব্রিটেনে প্রেরণ করেন। (তাবলীগ রিসালাত, খ. ৫/৮ ফারুক প্রেস, কাদিয়ান)

সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ

অন্য একটি প্রচারপত্রে সরকারের সমীপে মির্জা সাহেব তাঁর এ ধরনের আরেকটি গোয়েন্দা তৎপরতার কথা অত্যন্ত গর্বভরে পেশ করেছেন। তিনি লেখেন,

"আমাদের প্রতিবেদনে এমন সব অজ্ঞ মুসলমানের নাম-ঠিকানা আমরা উল্লেখ করেছি, যারা তাদের মনের গভীরে ইংরেজ রাজ্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ এবং ভারতবর্ষকে দারুল হরব বলে বিশ্বাস করে। যদিও এরা ততটা সচেতন নয় তথাপি খারাপ মুসলমানদের একটা তালিকা ইংরেজ বাহাদুরের সামনে আমরা পেশ করে দিয়েছি, যা অন্য সময় কাজে লাগতে পারে।" (তাবলীগ রিসালাত, খ. ৫, পৃ. ১১)

মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার

আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত আন্দোলনগুলোর সাথে গাদ্দারি করার উদাহরণস্বরূপ আঞ্জুমানে ইসলামিয়া, লাহোরের সেই স্মারকলিপিটির উল্লেখ করা যায়, যেটি মুসলমানদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রচলনের প্রসঙ্গে প্রেরণ করা হয়েছিল। মুসলমানদের এসব দাবিদাওয়ার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন মির্জা সাহেব। তিনি এ ধরনের তৎপরতার নিন্দা করে বলেছিলেন যে, ইংরেজদের অন্তরে বিশ্বস্ততার ছাপ অংকিত করা প্রয়োজন। আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার উচিত এ ধরনের তৎপরতা ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের উলামাদের নিকট থেকে এমন সব ফাতাওয়া সংগ্রহ করা, যেগুলোতে আমাদের মুরব্বি ও অনুগ্রহকারী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিপক্ষে সুস্পষ্ট রায় থাকবে। জিহাদ নিষিদ্ধ করে লিখিত ফাতাওয়া উলামাদের সিল-স্বাক্ষরসহ 'মকতুবে উলামায়ে হিন্দ' নামে বই আকারে প্রকাশ করাও একান্ত প্রয়োজন। (ইসলামী আঞ্জুমানের প্রতি আকুল আবেদন, বারাহীনে আহমদিয়া, ৩য় খণ্ড, সফীরে হিন্দ প্রেস, অমৃতসর)

১৯০৬ সালে যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন লীগের লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। শুধুমাত্র এ কারণেই মির্জা সাহেব মুসলিম লীগে কেবল যোগ দিতেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেনি বরং রীতিমতো এর নিন্দা করেন। তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল যে, আগামী দিন এ লীগই আবার ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারে। (সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত, কৃত-মির্জা গোলাম আহমদ এবং সীরাতে মসীহ মওউদ কৃত-মির্জা বশীরুদ্দীন, পৃ. ৪৩-৪৪)

একই মনোবৃত্তি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝেও বিরাজমান ছিল। যেমন, ১৯৩১ সালে কাশ্মীর কমিটির প্রতিষ্ঠা এবং সর্বশেষ মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদের গোপন তৎপরতায় এর ব্যর্থ হওয়া। তা ছাড়া আল্লামা ইকবালের এ কমিটি থেকে অব্যাহতি গ্রহণপূর্বক কমিটি ভেঙে দেওয়া, যার আলোচনা সামনে আসবে। এ সবই এখন ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে আল্লামা ইকবালের এ কথা জানা হয়ে গিয়েছিল যে, কাশ্মীর কমিটির সভাপতি (মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ) এবং সেক্রেটারি (আবদুর রহীম) তাঁরা দুজনই ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের নিকট গোপন তথ্য পাচারের মতো 'সৎ কর্মটি'ও নিয়মিত করে থাকেন। (পাঞ্জাবের রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ, পৃ. ২১০, আবদুল্লাহ্ মালিক)

এসব গোয়েন্দা তৎপরতা কাদিয়ানীদের পবিত্র কর্মকাণ্ডের এতই গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, শুধুমাত্র উপমহাদেশেই নয় বরং গোটা মুসলিম বিশ্বে তখনকার সময় থেকে আজ পর্যন্ত গোয়েন্দাবৃত্তির জাল বিস্তৃত রয়েছে। আজ পর্যন্ত পূর্ব থেকে পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা-ইউরোপব্যাপী কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইসলামবিরোধী চক্রের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংসের নিমিত্ত পরিচালিত এসব ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা ও এর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে সামনে আলোচিত হবে। মোটকথা, মুসলমানের জাগরণ সম্পর্কিত প্রতিটি প্রয়াসের কদিয়ানীরা বিরোধিতা করত। কারণ উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরণকে কাদিয়ানীরা খুবই ভয় করত। কেননা মুসলমানরা সজাগ হলে, তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে কাদিয়ানীদের মিশন ব্যর্থ হতে বাধ্য। রাসূলে আরাবীর (সা.) উম্মতের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে ভারতীয় নবীর জন্য অপর একটি উম্মত সৃষ্টির প্রয়াসও বানচাল হয়ে যাবে। (হরফে ইকবাল, পৃ. ১৪১-১৪২)

তা ছাড়া মুসলমানদের সাথে দ্বীনি, সামাজিক ও পারস্পরিক সকল সম্পর্ককে সম্পূর্ণ হারাম সাব্যস্তকারী কাদিয়ানী ধর্মে মুসলমানদের আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের সুযোগই বা কতটুকু ছিল? জনৈক কাদিয়ানী বলেছিল যে মসীহ মওউদের উদ্দেশ্য যখন কেবলই ইসলাম প্রচার তাহলে অন্যান্য মুসলিম সংস্থা ও সংগঠনের সাথে আমাদের সহযোগিতা করাই তো উচিত। তখন সাইয়্যেদ সরওয়ার শাহ্ কাদিয়ানী কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত 'আল-ফজল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড, ৭২ পৃ. তাং ২০ জানুয়ারি, ১৯১৫ সালে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এ প্রস্তাবের খণ্ডন করে শপথ করে বলে যে, "হযরত মসীহ্ মওউদের জীবনে অ-আহমদীদের সাথে কী সম্পর্ক ছিল? তিনি অ-কাদিয়ানীদের নিকট হতে কোনো দিনও চাঁদা সংগ্রহ করেননি। এই যদি আহমদী মতবাদ হতো তাহলে মসীহের যুগে আরো যত ধরনের আন্দোলন উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছে এসবের প্রতিই মসীহ মওউদের সমর্থন ও এতে আনন্দ প্রকাশ করতে হতো। তিনি এগুলোর জন্য চাঁদা দিতেন। কিন্তু জীবনে কোনো দিন তিনি এমন করেননি। কোনো মুসলমান এতিম বা বিধবার জন্য চাঁদা করা হলে মির্জা বশীরুদ্দীন বলতেন, মুসলমানদের সাথে মিশে চাঁদা দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই।" (আল-ফজল, কাদিয়ান, খণ্ড ১০, পৃ. ৪৫)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

পানিসংকট রোধে ইসলামের নির্দেশনা

মুফতী মুহাম্মদ মর্তুজা

পানি মহান আল্লাহর অমূল্য নিয়ামত। পানির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলা হয় পানির অপর নাম জীবন। পবিত্র কোরআনে এ উক্তিটির সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰہُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ

'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে আকাশ আর জমিন একসঙ্গে সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম, আর প্রাণসম্পন্ন সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবু কি তারা ঈমান আনবে না?' (সূরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৩০)

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عن أبى هريرة قال :قلت :يا رسول الله ، إنى إذا رأيتك طابت نفسى ، وقرت عينى ، فأنبئنى عن كل شىء . قال " :كل شىء خلق من ماء

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।' (মুসনাদে আহমাদ : ২/২৯৫)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ الَّذِیۡ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَنۡشَرۡنَا بِہٖ بَلۡدَۃً مَّیۡتًا ؕ کَذٰلِکَ تُخۡرَجُوۡنَ

'আর যিনি আসমান থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই তোমাদের বের করা হবে।' (সূরা : যুখরুফ, আয়াত : ১১)

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জীবন-জীবিকার সঙ্গে পানির সম্পর্ক খুব দৃঢ়। তাই পানির মতো অমূল্য নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং শুকরিয়া আদায় করা আমাদের সবার দায়িত্ব। তা না হলে গোটা পৃথিবীর মানুষকে বড় বিপদে পড়তে হতে পারে। জাতিসংঘের চলতি বছরের পানি উন্নয়ন প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০০ কোটির বেশি মানুষ পানি পেতে অসুবিধায় পড়তে পারে। এর আগে ২০১৮ সালে ৩৬০ কোটি মানুষ বছরে অন্তত এক মাস পানি পেতে অসুবিধায় পড়ার কথা জানা গিয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা অনাগত এই কঠিন পরিস্থিতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করলেও হাদীস শরীফে এর আধ্যাত্মিক একটি কারণ উল্লেখ আছে। উম্মতের কোনো অপরাধের কারণে তাদের মধ্যে অনাবৃষ্টি, খরা ও পানির সংকট দেখা দেবে, সে বিষয়ে আগেই অবহিত করেছেন মহানবী (সা.)। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عَنۡ عَبۡدِ اللّٰہِ بۡنِ عُمَرَ، قَالَ أَقۡبَلَ عَلَیۡنَا رَسُولُ اللّٰہِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ " یَا مَعۡشَرَ الۡمُہَاجِرِینَ خَمۡسٌ إِذَا ابۡتُلِیتُمۡ بِہِنَّ وَأَعُوذُ باللّٰہِ أَنۡ تُدۡرِکُوہُنَّ لَمۡ تَظۡہَرِ الۡفَاحِشَۃُ فِی قَوۡمٍ قَطُّ حَتَّی یُعۡلِنُوا بِہَا إِلاَّ فَشَا فِیہِمُ الطَّاعُونُ وَالۡأَوۡجَاعُ الَّتِی لَمۡ تَکُنۡ مَضَتۡ فِی أَسۡلاَفِہِمُ الَّذِینَ مَضَوۡا . وَلَمۡ یَنۡقُصُوا الۡمِکۡیَالَ وَالۡمِیزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِینَ وَشِدَّۃِ الۡمُؤۡنَۃِ وَجَوۡرِ السُّلۡطَانِ عَلَیۡہِمۡ . وَلَمۡ یَمۡنَعُوا زَکَاۃَ أَمۡوَالِہِمۡ إِلاَّ مُنِعُوا الۡقَطۡرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوۡلاَ الۡبَہَائِمُ لَمۡ یُمۡطَرُوا وَلَمۡ یَنۡقُضُوا عَہۡدَ اللّٰہِ وَعَہۡدَ رَسُولِہِ إِلاَّ سَلَّطَ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ عَدُوًّا مِنۡ غَیۡرِہِمۡ فَأَخَذُوا بَعۡضَ مَا فِی أَیۡدِیہِمۡ . وَمَا لَمۡ تَحۡکُمۡ أَئِمَّتُہُمۡ بِکِتَابِ اللّٰہِ وَیَتَخَیَّرُوا مِمَّا أَنۡزَلَ اللّٰہُ إِلاَّ جَعَلَ اللّٰہُ بَأۡسَہُمۡ بَیۡنَہُمۡ

আবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারি আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তা ছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসিবত এবং জাকাত আদায় করে না হলে তখন আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূপৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী

না থাকত, তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সব কিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।' (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪০১৯)

উল্লিখিত হাদীসে জাকাত প্রদানে অবহেলাকে অনাবৃষ্টি ও পানিসংকটের কারণ বলে অবিহিত করেছেন নবীজি (সা.)। এ ছাড়া পানির মতো নিয়ামতের অবমূল্যায়ন তো আছেই। মানুষ যখন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না, অপচয় করে, তখন তাদের থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পানির ক্ষেত্রেও হয়তো তাই হতে চলেছে। যদি ওপরে উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যমতে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণীর উসিলায় আল্লাহ আমাদের জন্য পুরোপুরি বৃষ্টি ও পানির উৎস বন্ধ করে দেননি। তবে সংকট যে তৈরি হচ্ছে, তা দৃশ্যমান।

জাতিসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডাব্লিউএমও) গত বছরের অক্টোবরে এক রিপোর্টে এ তথ্য জানিয়েছিল।

বিশ্ব পানি উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২২-এ আরো বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের ৯৯ শতাংশ সুপেয় পানির উৎস হলো ভূগর্ভস্থ। সেই পানির অবমূল্যায়ন, অব্যবস্থাপনা এবং অপব্যবহারের কারণে এটি ক্ষতির মুখে পড়ছে।

তাই আমাদের দায়িত্ব হলো, পানির অপব্যবহার রোধ করা, পানির অপচয়ের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। কারণ মহান আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

'হে আদম সন্তান, প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা উত্তম পোশাক গ্রহণ করো, আর খাও, পান করো; কিন্তু অপচয় কোরো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

মহানবী (সা.) অপচয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোর ছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামকে পানির অপচয়ের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এমনকি প্রবাহিত নদীর পাড়ে থাকলেও পানির অপচয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ " مَا هَذَا السَّرَفُ " . فَقَالَ أَفِى الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ " نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ "

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) সাদ (রা.)-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অজু করছিলেন। তিনি বলেন, এই অপচয় কেন? সাদ (রা.) বলেন, অজুতেও কি অপচয় আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে থাকো।' (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৪২৫)

প্রিয় পাঠক, একবার ভাবুন তো, পানির অপচয় রোধ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হলে মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে অজুর ক্ষেত্রেও এর ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অজু এমন একটি ইবাদত, যা ছাড়া নামায পড়া যায় না, আল্লাহর কোরআন স্পর্শ করা যায় না। অজুর মাধ্যমে বান্দার গোনাহগুলো ঝরে যায়। তার পরও মহানবী (সা.) অজু করার ক্ষেত্রেও পানির অপচয় যাতে না হয়ে যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আমরা খাওয়াদাওয়ার সময় কত পানি অপচয় করে ফেলি, আধুনিক ওয়াশরুমে কিংবা বেসিনে হাত-মুখ ধোয়ার সময়ও প্রচুর পরিমাণ পানি অযথাই নষ্ট হয়ে যায়, গোসলের সময় আমাদের দেশের মানুষের যে পরিমাণ পানি অপচয় হয়, পানি সংকটময় এলাকাগুলোতে হয়তো সে পরিমাণ পানি একটি মানুষের সারা দিনেও ব্যবহার করা হয় না।

যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহারে ইসলামের কোনো বিধি-নিষেধ নেই; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার ও অপচয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামের আপত্তি রয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

'তোমরা পানাহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো যতক্ষণ না তার সঙ্গে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩৬০৫)

তাই আমাদের উচিত, পানির অপচয় থেকে বিরত থাকা, মহান আল্লাহর এই নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা, আল্লাহর প্রদত্ত প্রকৃতিকে অহেতুক ধ্বংসের মুখে না ফেলা, পরিবেশ রক্ষায় সচেতন থাকা, কখনো কখনো অতিরিক্ত খরা ও পানিশূন্যতা অনুভব করলে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কারণ পানিসহ গোটা বিশ্বভ্রহ্মাণ্ডের মালিক আল্লাহ, তিনি চাইলে এক মুহূর্তে মরুর বুকে মহাসাগর তৈরি করে দিতে পারেন।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মু'আমালা

নূরুল আলম
সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

(ক) হযরত! আমরা সুদ থেকে বাঁচার নিয়্যাতে একটি লেনদেন এভাবে করেছি যে এক ভাইয়ের কাছে পাঁচ লক্ষ টাকার একটি সোনার চেইন ছিল, প্রথমে তার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ দিয়ে ওই চেইনটি ক্রয় করে কব্জ করেছি, তারপর উক্ত চেইনটি ওই ব্যক্তির কাছেই সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকায় বাকিতে বার কিস্তিতে পরিশোধ করবে, এই শর্তে বিক্রি করেছি। তবে উক্ত মু'আমালা করার পূর্বে আমরা মৌখিক চুক্তি করেছিলাম।

(খ) আরেকটি লেনদেন, এক ব্যক্তির কাছে একটি গরু ছিল প্রথমে তার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে কব্জ করেছি। অতঃপর তার কাছেই ত্রিশ হাজার টাকায় বাকিতে বার কিস্তিতে পরিশোধ করবে এই শর্তে বিক্রি করেছি। এখানেও লেনদেন করার পূর্বে আমরা মৌখিক চুক্তি করেছি।

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, আমাদের উক্ত লেনদেনগুলো শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত চুক্তিগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের বাহানামাত্র। এ ধরনের লেনদেনও সুদি কারবারে অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা বৈধ হবে না? (রদ্দুল মুহতার : ৫/২৭৩, সুনানে আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৪৬২, আল হেদায়া : ৩/৫৯, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ৩/১৪৩, ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত, পৃ. ১৪১)

প্রসঙ্গ : ইজারা

মাও. মাহমুদুল হাসান
কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

প্রশ্ন : একটি সমিতি জনাবের নিকট থেকে ১১ মাসের জন্য একটি বাসা ভাড়া নেবে। উক্ত বাসা ভাড়ার সিকিউরিটি বা জামানত হিসেবে সমিতি জনাবকে ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অগ্রিম পরিশোধ করবে এবং বাসা ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে ৩১০০ (তিন হাজার একশত) টাকা পরিশোধ করবে। চুক্তি শেষে সমিতি সিকিউরিটি হিসেবে প্রদানকৃত ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ফেরত পাবে।

উল্লেখ্য, সমিতি ৩১০০ টাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে উক্ত বাসা তৃতীয় পক্ষের নিকট ৪৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকায় ভাড়া দেবে। এতে প্রতি মাসে সমিতি আয় করবে (৪৫০০-৩১০০=১৪০০) ১৪০০/- (এক হাজার চারশত) টাকা। অতএব মহোদয় আশা করি উল্লিখিত বিষয়ে শরয়ী মতামত প্রদান করে বাধিত করবেন।

সমাধান :

বাসা ভাড়া দেওয়ার সময় ফেরত দেওয়ার শর্তে অগ্রিম প্রদানকৃত টাকা যদি মেয়াদ শেষে বাসা ছেড়ে দেওয়ার নিশ্চয়তার জন্য জামানত বা বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা জায়েয বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে ভাড়াটিয়া উক্ত বাসা অন্যের নিকট বেশি ভাড়ায় দিতে চাইলে কিছু সংস্কারমূলক কাজ করে নেবে যেমন রং করে দেওয়া বা কিছু ডেকোরেশনের কাজ করে দেওয়া ইত্যাদি অথবা ভিন্ন মুদ্রায় ভাড়া ধার্য করবে। (আল হিদায়া : ৪/৫৩১-৫৩২, রদ্দুল মুহতার : ৬/৪৮২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১২/৩৭২)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মো. হারুনুর রশিদ
কুষ্টিয়া।

জিজ্ঞাসা :

প্রশ্ন : বিধবা নারী ইদ্দতকালীন সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ঘর-সংসার করেছে এবং সন্তান পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেছে। বর্তমানে সন্তানের বয়স আনুমানিক ১২ বছর। এখানে উল্লেখ্য যে বিবাহের সময় ইদ্দতকালীন বিবাহ হারাম– ইসলামিক এই আইনটা সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না। এখন করণীয় কী?

সমাধান :

বিধবা মহিলা তার ইদ্দতে ওফাত পালন অবস্থায় অন্যত্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যদি বিবাহ বসে তাহলে ইদ্দত শেষে উক্ত বিবাহ দোহরানো আবশ্যক। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত বিধবা মহিলার ইদ্দতকালীন বিবাহ সহীহ হয়নি। তাই উক্ত স্বামীর সাথে সংসার করতে হলে বিবাহ দোহরানো আবশ্যক। যার পদ্ধতি মৌখিকভাবে জেনে নেবেন। তবে সন্তান উক্ত স্বামীর বলেই বিবেচিত হবে। (রদ্দুল মুহতার : ৩/১৩২, আল হেদায়া : ২/৪২৭, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া : ৪/৬৬)

প্রসঙ্গ : গোরাবা তহবিল

কছিম উদ্দিন
টঙ্গী, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

মুহতারাম! অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানানো যাচ্ছে যে আমরা হালিমা ইসলামী সেন্টার কওমী মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা বেশ কিছুদিন যাবৎ পরিচালনা করে আসছি। আমাদের মাদ্রসার সাধারণ তহবিল ও গোরাবা তহবিল নামে দুটি তহবিল আছে। সদকা, যাকাত, ফেতরা, কোরবানীর পশুর চামড়া ও মান্নাত থেকে প্রাপ্ত টাকা গোরাবা তহবিলে এবং মাসিক চাঁদা, এককালীন অনুদান ও নির্মাণ খাতে প্রাপ্ত বিশেষ অনুদানের টাকা সাধারণ তহবিলে জমা করা হয়।

আমাদের মাদ্রাসার ৩০ জন গরিব, ২৩ গরিব কিন্তু অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও ২ জন সচ্ছল আবাসিক ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার জন্য একটি লিল্লাহ বোর্ডিং আছে। এ লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের আনুষঙ্গিক যাবতীয় খরচ গোরাবা তহবিলের টাকায় বহন করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বোর্ডিংয়ের পুরো খাওয়ার খরচ বহনে অক্ষম বিধায় আংশিক বহন সাপেক্ষে উল্লিখিত ওই ২৩ জন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছাত্রের অবিভাবকদের গোরাবা তহবিল থেকে তাদের সন্তানদের আংশিক খরচ বহনে সম্মতি থাকায় তাদেরও খাওয়ার খরচ গোরাবা তহবিলের টাকা থেকে বহন করা হচ্ছে। বাকি ২ জন সচ্ছল ছাত্রের জন্য আলাদা খাবারের ব্যবস্থা করা ব্যয়বহুল ও ঝামেলাপূর্ণ বিধায় ওদের খাবার ব্যবস্থাও গোরাবা তহবিলের টাকা থেকে বহন করা হচ্ছে। এ ছাড়া বোর্ডিংয়ে উক্ত মাদ্রাসার ১০ জন সম্মানিত শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারীর খাওয়ার ব্যবস্থাও ওই গোরাবা তহবিলের টাকা থেকে বহন করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-বোনাস, মাদ্রাসার বিদ্যুৎ বিল, অফিস খরচ ও ভবন নির্মাণের খরচাদি সাধারণ তহবিলের টাকা থেকে বহন করা হচ্ছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুহতারামের নিকট আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

(ক) আমরা যে তরতীবে মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ করছি তা ইসলামী শরীয়তসম্মত কি না?

(খ) সাধারণ তহবিলের টাকার অপ্রতুলতার এবং এই লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের সব ছাত্রই কমবেশি গরিব হওয়ার কারণে এখানকার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, মাদ্রাসার বিদ্যুৎ বিল ও অফিস খরচ গোরাবা তহবিল থেকে সম্পূর্ণ বা আনুপাতিক হারে বহন করার ইসলামী শরীয়তসম্মত কোনো সুরত আছে কি না?

(গ) আমাদের বর্তমান তরতীবে কোনো গলদ থাকলে সহীহ তরতীবের সুরত কী? জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জানালে এ মহতী কাজ সহীহভাবে পরিচালনা করা আমাদের জন্য সহজ হবে।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। কেননা গোরাবা তহবিলের টাকা যথাযথ খাতে ব্যয় না হয়ে অন্য খাতেও ব্যয় হচ্ছে, যা শরীয়ত সমর্থিত নয়।

সাধারণ তহবিলের টাকার অপ্রতুলতার মুহূর্তে সচ্ছল ছাত্রদের খোরাকী, শিক্ষক-কর্মচারীদের খানা ও বেতন, মাদ্রাসার বিদ্যুৎ বিল, অফিস খরচ ইত্যাদিতে গোরাবা তহবিলের টাকা ব্যয় করা শরীয়ত সমর্থিত নয়, তবে একান্ত অপারগতায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করার অবকাশ রয়েছে। তা এই যে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ছাত্রদের থাকা-খাওয়া এবং বিদ্যুৎ বিল বাবদ মাসিক ফি নির্ধারণ করে দেওয়া, অতঃপর গোরাবা ফান্ড থেকে মাসিক ফি পরিমাণ টাকা গরিব ছাত্রদের মালিকানায় দিয়ে ফি বাবদ তা উসূল করে নেওয়া। অথবা ছাত্রদের পক্ষ থেকে কাউকে উকিল নিযুক্ত করে তার মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পাদন করা। এই ফান্ডের অবশিষ্ট টাকা দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন প্রদানসহ মাদ্রাসার যেকোনো কজে ব্যয় করা যাবে।

উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে সচ্ছল ছাত্রদের কাছ থেকে যথানিয়মে ফি আদায় করে একত্রে খানা রান্না করতে কোনো অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ৬/৪৪৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ :৬/২০৭, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া : ৫/১৫০, খায়রুল ফাতাওয়া : ৩/৪০৫)

প্রসঙ্গ : হাদিয়া

মো. মুখলিছুর রহমান
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

কোনো ব্যক্তি যদি চাকরির জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুরোধ করে এই বলে যে আপনাদের তো বড় বড় অফিসার আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদের মাধ্যমে সুপারিশ করে যদি আমার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমরা আপনাকে কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করব। এখন এই টাকা যদি খুশি এবং দাবি ছাড়া দেয় অথব দাবি করে দেওয়া হয় তাহলে নেওয়া জায়েয হবে কি না?

বি.দ্র. : প্রকাশ থাকে যে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কিছু পাওয়ার আশ্বাস না থাকে তাহলে সে কাজে অবশ্যই অনাগ্রহী হবে। অতএব সে ক্ষেত্রে আগ্রহী হওয়ার শরঈ পন্থা কী হতে পারে?

সমাধান :

কোনো বৈধ প্রয়োজনে কারো জন্য সুপারিশ করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ, কিন্তু তা বিনিময় যোগ্য নয়। তাই

শুধু সুপারিশের বিনিময় চুক্তির করে নেওয়া জায়েয হবে না, বরং তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে পূর্বচুক্তি ব্যতীত নির্মোহ, ন্যায়সংগত সুপারিশকারীকে স্বেচ্ছায় হাদিয়াস্বরূপ কিছু দিলে তা তার জন্য গ্রহণ করার অনুমতি আছে। হ্যাঁ, সুপারিশের সাথে কোনো শারীরিক শ্রম যার ওপর বিনিময় নেওয়া বৈধ। যেমন চিঠি নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কোনো শ্রম তার সাথে যোগ হলে ওই শ্রমের বিনিময় চুক্তি করে নেওয়া যাবে। (সুনানে তিরমিযী : ১৩৩৭, সুনানে আবি দাউদ : ৩৫৪১, এমদাদুল ফাতাওয়া : ৩/৩৪১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ৮/২৪৮)

প্রসঙ্গ : পরীক্ষা ফি

মাও. নূর সোলাইমান
চরপাতা মাদ্রাসা, দৌলতখান, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

মুহতারাম! আমাদের মাদ্রাসায় বছরে ছাত্রদের থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। উক্ত তিন পরীক্ষায়ই ছাত্রদের থেকে ফি উত্তোলন করা হয়। এবং উক্ত টাকা থেকে প্রশ্ন প্রস্তুত, কাগজ খরিদ এবং হলের যাবতীয় খরচের পর অবশিষ্ট টাকা উস্তাদদের মাঝে হলের নেগরানী, উত্তরপত্র দেখা এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি বাবদ শিক্ষকগণের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা হয়। এখন জানার বিষয় হলো, বর্ণিত সুরত শরীয়ত মোতাবেক বৈধ কি না? এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক নিয়ম কোনটি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

উল্লেখ্য : মাদ্রাসার নীতিমালায় গঠনতন্ত্রের মূলনীতিমালায় পরীক্ষার যাবতীয় খরচের পর অবশিষ্ট টাকা শিক্ষকগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যথানীতিমালায় মাদ্রাসার শিক্ষাসচিব এর গুণাগুণ ও দায়িত্বের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে তিনি ছাত্রদের থেকে ফি উত্তোলন করতঃ যাবতীয় খরচের পর অবশিষ্ট টাকা উস্তাদগণের সাহায্যে বণ্টন করে দেবেন।

সমাধান :

মাদ্রাসার গঠনতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী অথবা স্থানীয় মাদ্রাসাসমূহের প্রচলন অনুযায়ী পরীক্ষার ফি বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে যে টাকা উত্তোলন করা হয়, তা থেকে প্রশ্ন প্রস্তুত করা, কাগজ খরিদ করা এবং হলের যাবতীয় খরচের পর অবশিষ্ট টাকা শিক্ষকদের মাঝে হলের নেগরানী, উত্তরপত্র দেখা এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি বাবদ শিক্ষকগণের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার মধ্যে শরীয়তে কোনো আপত্তি নেই। (রদ্দুল মুখতার : ৫/৯৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ৪/৫০৭, এমদাদুল ফাতাওয়া : ৩/৪০২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১৫/২৮৬-২৮৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদ ফান্ড

মো. হুমায়ুন কবীর
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

হুজুরের প্রতি নিবেদন এই যে আমাদের জামে মসজিদের ফান্ডে ২০,০০০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা ১ বছর যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে এবং প্রতি মাসে আরো প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে বিভিন্নভাবে কালেকশন হচ্ছে।

আমরা উক্ত মসজিদের ফান্ডের টাকাগুলি শরীয়তসম্মত উপায়ে খরচ করতে চাই। তাই ফাতওয়ার প্রয়োজন।

সমাধান :

দাতার পক্ষ থেকে দান করার সময় মসজিদ সংক্রান্ত যেকোনো কাজে টাকা ব্যয় করার অনুমতি থাকা অবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত টাকাগুলো মসজিদ সংক্রান্ত যত কাজ আছে প্রত্যেক কাজেই ব্যবহার করা যাবে। যেমন, মসজিদ নির্মাণ, সম্প্রসারণ, মেরামত করা ও রং দেওয়া। মসজিদে এসি ও টাইলস লাগানো। মসজিদের জন্য কার্পেট ক্রয় করা। ইমাম-মুয়াজ্জিন ও খাদেমের পর্যাপ্ত পরিমাণ বেতন দেওয়া। বিদ্যুৎ ও পানির বিল দেওয়া। এমনিভাবে মসজিদের জন্য কোনো জমি ইত্যাদি খরিদ করা। (আদ্দুররুল মুখতার : ১/৩৮১, আল বাহরুর রায়েক : ৫/৩৫৬, হাশিয়াতুত ত্বাহতাবী : ২/৫৪০, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১২/২৫১)

প্রসঙ্গ : মসজিদের মাল

মাও. মাকসুদুল্লাহ
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, কুষ্টিয়া।

জিজ্ঞাসা :

জনাব! আমাদের এলাকার মসজিদের গাছে একটি মৌচাক ছিল। কয়েকজন মুসল্লি মিলে চাকটি ভেঙে মধু নিয়ে যায়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তাদের এই কাজ সঠিক হয়েছে কি না? উক্ত মধু তাদের জন্য বৈধ হবে কি না? বর্তমানে তাদের কী করণীয় রয়েছে?

সমাধান :

মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমিন হতে কোনো কিছু ব্যক্তিগতভাবে ভোগ-দখল করা বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদের গাছ হতে মৌচাক কেটে মধু নেওয়া বৈধ হয়নি। তাদের করণীয় হলো, মধু মসজিদে ফিরিয়ে দেবে। সম্ভব না হলে মধুর মূল্য আদায় করে দেবে। সাথে সাথে নিজেরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করে ভবিষ্যতে এমন কাজ না করার অঙ্গীকার করবে। (আদ্দুররুল মুখতার : ৪/৪৩২, আল বাহরুর রায়েক : ৫/৩৪১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ২/৪৭৭, আল হেদায়া : ৫/২৫২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম : ১৩/৪১৪)